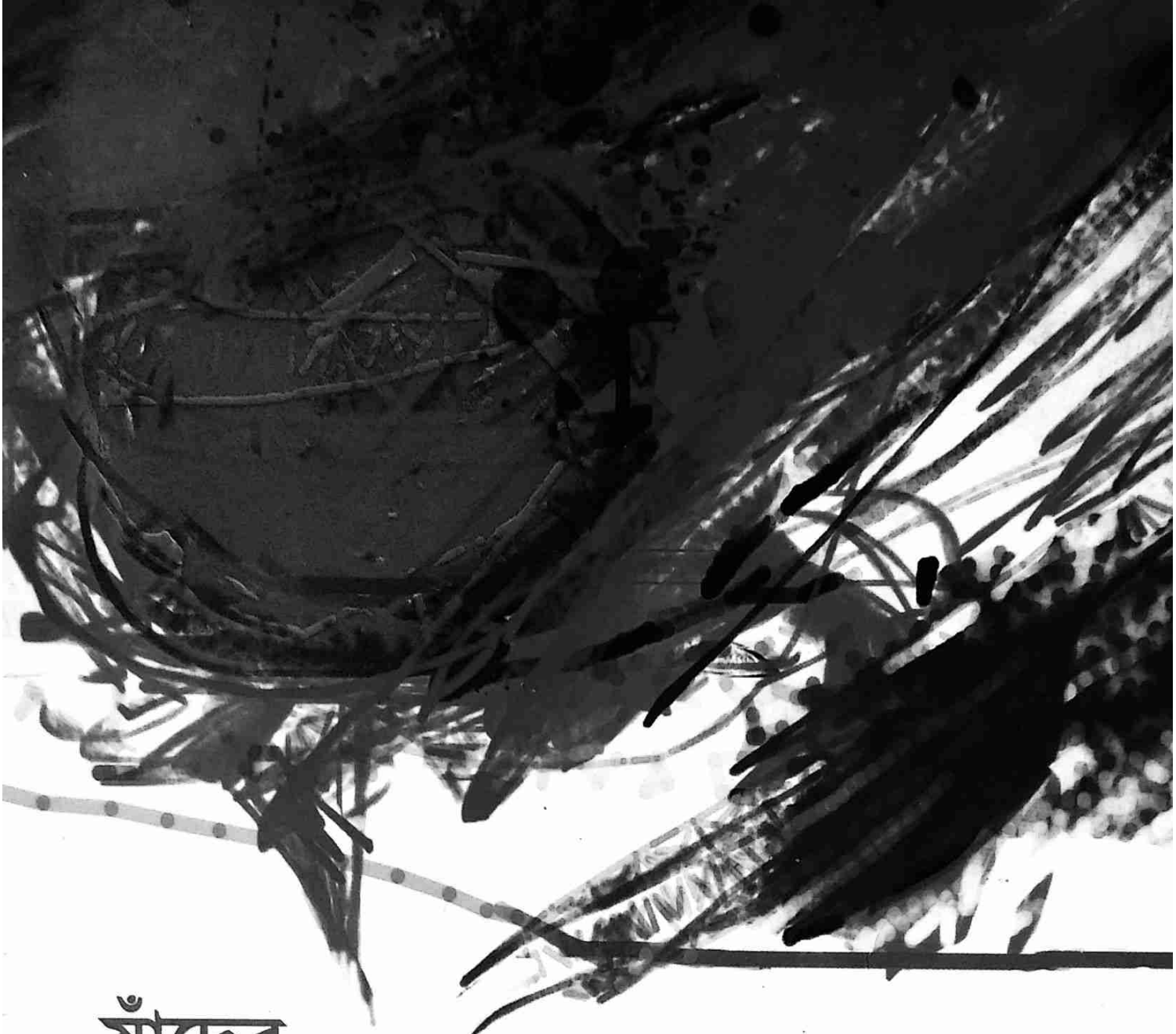

যাঁদের
রক্তে
আমাদের
গৌরব

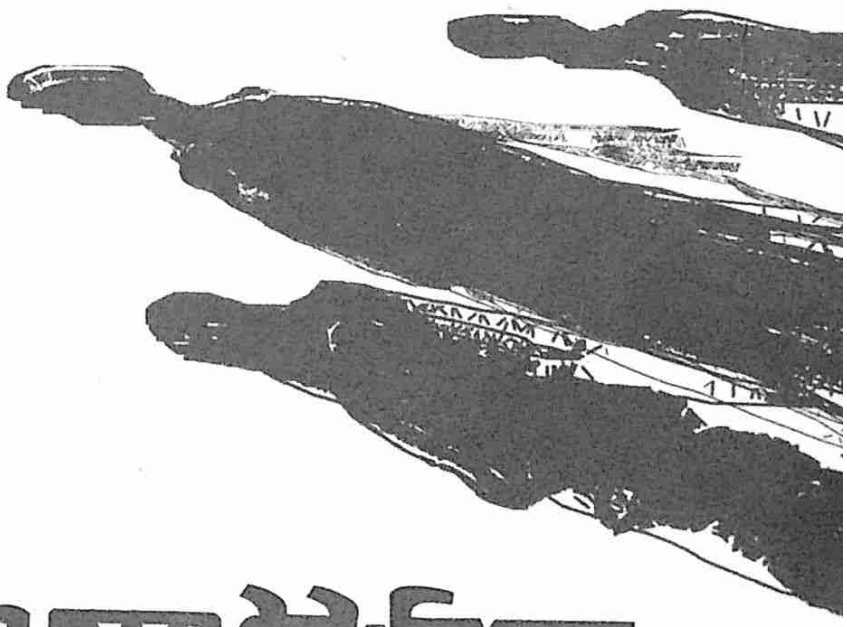

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

যাঁদের রক্তে আমাদের গৌরব

গৌরবের ৬০ বছর

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

উৎসর্গ

ভাষার সংগ্রামে, স্বাধিকার ও মুক্তি সংগ্রামে
সমাজ প্রগতির সংগ্রামে, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সংগ্রামে
এবং
গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এই মাতৃভূমির যে সকল
সন্তানেরা জীবন উৎসর্গ করেছেন
তাঁদের উদ্দেশ্যে

১৯৩২
"যে ভোলে ভুলুক
শত মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না
বাংলাদেশ"
বাঙালির শিক্ষা আন্দোলন: তিরাশি থেকে
নব্বই দশক পূর্বে আমরিকতন্ত্র/স্বৈরাচার ও
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের
বীর শহীদদের স্মরণে
বাঙালির শিক্ষা আন্দোলনের
বীর শহীদরা অমর
৬২
তিরাশি থেকে নব্বইয়ের স্বৈরতন্ত্র ও
৮৩
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ছাত্র
আন্দোলনের বীর শহীদরা অমর
শিক্ষা অধিকার চত্বর
শুভ উদ্বোধন করেন
জনাব সাদেক হোসেন খোকা
মাননীয় মেয়র, ঢাকা সিটি করপোরেশন
০২ আশ্বিন ১৪১৫ / ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৮

প্রকাশকাল :
২৬ এপ্রিল, ২০১২

সম্পাদনা পরিষদঃ
লুনা নূর - আহবায়ক
আরিফুল ইসলাম নাদিম- সদস্য সচিব
সদস্য
মন্টি বৈষ্ণব
মেহেদী হাসান পিয়াস
মাহবুব হাসান
মীর মোশাররফ হোসেন
মুজাহিদুল ইসলাম উইন
রাজীব সাহা

সার্বিক সহযোগিতা :
রুমান মাহ্‌মুদ
মাহামুদুর রহমান বিরল
ফজলুল করিম নেলসন
সুমন সেনগুপ্ত
ও
সাপ্তাহিক একতা

প্রচ্ছদ :
চিন্ময় দেবর্ষী

অক্ষর বিন্যাশ :
লেখনী কম্পিউটারস্
২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক, পুরানা পল্টন, ঢাকা

লে-আউট :
চিত্রকল্প
১৭৯/৩ (৩য়তলা) ফকিরেরপুল, ঢাকা

মূদ্রণ :
মাটি আর মানুষ
১৭৯/৩ ফকিরেরপুল, ঢাকা

মূল্য : ১০০ টাকা

৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির
শহীদ স্মৃতি সংরক্ষণ ও ভাস্কর্য নির্মাণ উপ-পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত

যাঁদের রক্তে আমাদের গৌরব

মুখবন্ধ

আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে যারা নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয় তারাইতো মহান। অস্থির সময়ের দরজায় দাঁড়িয়ে যখন আমাদের স্বপ্ন-আদর্শের লড়াই-মানবিক বোধ সব হাওয়ায় মিলিয়ে যায় তখন তারাই হয় আমাদের অবলম্বন।

ষাট বছরের পথচলায় ছাত্র ইউনিয়ন পরিবারের অসংখ্য তরুণ তাঁদের তাজা প্রাণ উৎসর্গ করেছে স্বপ্ন বিনির্মাণে, আদর্শের লড়াইয়ে। মূলত তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই আমাদের প্রয়াস।

লড়াই-সংগ্রামের ঘটনা বহুল তাঁদের যাপিত জীবনের তুলনায় এ প্রকাশনায় উপস্থাপিত জীবনী খুবই সংক্ষিপ্ত এবং নগণ্য। অবস্থার প্রেক্ষিতে কখনও কখনও হয়ত পুরো ঘটনা বা জীবনী সংগ্রহ করা হয়নি, আবার এও সত্য সংগৃহিত অনেক তথ্য সংরক্ষণও করা হয়নি। এ অবস্থায় এর চেয়ে বেশি তথ্য সমৃদ্ধ এবং পূর্ণাঙ্গ একটি প্রকাশনা বের করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তারপরও সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য। কারণ লক্ষ শহীদের জীবনদান আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে আগামী দিনে। এখনও যারা ছাত্র ইউনিয়ন করছে, আগামী দিনে যারা করবে তাদের সকলের পাথেয় হয়ে থাকবে শহীদের দেখানো পথ।

এ প্রকাশনা বের করতে যারা সহযোগিতা করেছে তাদের প্রতি স্বকৃতজ্ঞ অভিবাদন। শহীদ পরিবার এবং তাদের ঘনিষ্ঠজনদের প্রতিও জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা। ছাত্র ইউনিয়নের এ প্রজন্মের সদস্যদের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ, মমতাবোধ এবং এ কাজে আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সবশেষে বিনম্র চিত্তে একটি কৈফিয়ত সেটা হলো সবটুকু আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও আমরা হয়ত সকল শহীদদের নাম জীবনী প্রকাশ করতে পারিনি। আমাদের এ অপারগতাকে যৌক্তিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করবেন সকলে। এবং যদি কোন তথ্য কারও কাছে থেকে থাকে ভবিষ্যতে ছাত্র ইউনিয়নকে অবগত করার মধ্য দিয়ে এ ধরনের প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করবেন আশা করি।

যাঁদের রক্তে আমাদের গৌরব

সূচিপত্র

শহীদ মতিউল ইসলাম ০৯
শহীদ মির্জা কাদেরুল ইসলাম ১০
শহীদ সুজন মোল্লা ১১
শহীদ মোজাম্মেল হক ১১
শহীদ ওলিউর রহমান ১১
শহীদ বিপ্রদাশ রায় ১২
শহীদ মোস্তফা হাসান আকন্দ ১২
শহীদ সারোয়ার খান মুরাদ ১৩
শহীদ খায়রুল জাহান ১৩
শহীদ গোবিন্দ সাহা ১৪
শহীদ ফজলুর রহমান ১৪
শহীদ জিল্লুর মোরশেদ মিঠু ১৪
শহীদ তপন সরকার ১৫
শহীদ জসীম উদ্দিন আহমদ ১৫
শহীদ রহিম বক্স খোকা ১৫
শহীদ নুরুল ইসলাম ১৬
শহীদ কাজল পাল ১৬
শহীদ নাসিরুজ্জামান ননী ১৬
শহীদ তাজুল ইসলাম ১৭
শহীদ মঈন হোসেন রাজু ১৮
শহীদ রেজাউল করিম নতুন ১৯
শহীদ রওনাকুল ইসলাম বাবর ২০
শহীদ আব্দুল হাই ২০
শহীদ মাজহারুল হক আসলাম ২১
শহীদ মো. আনোয়ারুল ইসলাম ২১
শহীদ শাহাদাত হোসেন সারু ২২
শহীদ মাহবুব উল আলম ২২
শহীদ প্রোটন কুমার দাশগুপ্ত ২৩
শহীদ বসন্ত ব্যানার্জী ২৩
শহীদ সঞ্জয় তলাপাত্র ২৪
শহীদ আবুল হাশেম ২৫
শহীদ মো. মোখলেছুর রহমান ২৫
শহীদ সৈয়দ আমিনুল হুদা টিটো ২৬
শহীদ ময়নুল আকতার রুবেল ২৭
শহীদ মো. আজহারুল ইসলাম ২৭
শহীদ গৌরপদ দেব কানু ২৭
শহীদ ওবায়দুর রউফ পলু ২৮
শহীদ সুভাষ ২৮
শহীদ নিবাস ভট্টাচার্য বলাই ২৮
শহীদ সিরাজুম মুনীর ২৯
শহীদ নিজাম উদ্দিন আজাদ ২৯
শহীদ শহীদুল্লাহ সাউদ ৩০
শহীদ রতন কুমার বর্মণ ৩০
শহীদ মোঃ এজাহারুল ইসলাম ৩০
শহীদ জগৎজ্যোতি ৩১
শহীদ অজিত সরকার ৩৩
শহীদ একে শরফুদ্দিন আহমেদ দুলাল ৩৩
শহীদ নজরুল ইসলাম মজনু ৩৩
শহীদ মোঃ রফিকউদ্দিন আহমেদ বুলবুল ৩৩
শহীদ সমীর সোম ৩৪
শহীদ মোঃ বদিউল আলম ৩৪
শহীদ নিতাই দেবনাথ ৩৪
শহীদ মোঃ আলী জিন্নাহ ৩৪
শ্রদ্ধাঞ্জলী ৩৫

শহীদ মতিউল ইসলাম

যে জীবন ফড়িংয়ের, সে জীবন কি করে জানবে মতিউল কি বিশাল হৃদয়ে বাঁচতে চেয়েছিল.. শ্রমিক আন্দোলনে নিয়োজিত জনকের সন্তান মতিউল ইসলাম ১৯৫১ সালে রাজবাড়ীর পাংশা থানার বাহাদুরপুর (বাগমারা) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গাইবান্ধা সরকারি কলেজ থেকে আই. এ পাশ করার পর ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনে ভর্তি হন। ৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধে পিতা তৎকালীন প্রাদেশিক সদস্য মোসলেমউদ্দিন এবং চাচাত ভাই খবিরুজ্জামানের (মুক্তিযুদ্ধে শহীদ, বীর বিক্রম খেতাবপ্রাপ্ত) সাথে ২ নং সেক্টরে (কুমিল্লা অঞ্চলে) বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ১৪৮নং কক্ষের বাসিন্দা ছিলেন মতিউল ইসলাম। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার আত্মোৎসর্গকারী এ বীরযোদ্ধা বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জহুরুল হক হল শাখার প্রচার সম্পাদক ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিশ্ব নির্মাণে বদ্ধপরিকর মতিউল ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের বিপক্ষে ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে সামনের কাতারের সৈনিক ছিলেন। নাপাম বোমায় নিশ্চিহ্ন মাইলাই গ্রামের ৫০০ নারী-পুরুষ হত্যা, উত্তর ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের স্বীকৃতিদান এবং সাম্রাজ্যবাদের নিপাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি ডাকসু সহযোগে প্রতিবাদ মিছিল বের করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হওয়া মিছিলের লক্ষ্য ছিল মার্কিন তথ্যকেন্দ্র (ইউসিস) ভবন, মতিউল ছিলেন মিছিলের সামনের সারিতে। ভিয়েতনামের জনগণের বিরোচিত সংগ্রামে সংহতি প্রকাশের মিছিলে পুলিশ একপর্যায়ে গুলি চালায়। শহীদ হন মতিউল ইসলাম এবং মীর্জা কাদের। গুলি মতিউলের গলা ভেদ করে চলে যায়। প্রতিবাদে পরদিন ঢাকাসহ সারাদেশে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। বাংলাদেশ সরকার ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে। ঢাকা থেকে ইউসিস ভবন প্রত্যাহার করা হয়। মতিউল-কাদেরের রক্তে বাংলাদেশ-ভিয়েতনামের জনগণের সংহতি বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ২০০০ সালে ভিয়েতনাম সরকার মতিউল ইসলামকে 'ভিয়েতনামের জাতীয় বীর' ঘোষণা করে। মতিউলের কণ্ঠ আজো থামেনি। দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের হত্যা-ধ্বংস-নির্যাতনের প্রতিবাদে আজো মতিউলের সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন সোচ্চার। মতিউল-কাদেরের রক্তে সাম্রাজ্যবাদের পতন অনিবার্য হয়ে উঠছে। লাল সালাম শহীদ মতিউল। তোমার রক্ত পতাকা হাতে আমরা চলি অবিরাম।

শহীদ মির্জা কাদেরুল ইসলাম

১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি। ইউসিস ভবনে যাচ্ছে ছাত্র-জনতা। যাচ্ছে বিচার চাইতে, কেন নাপামের মরণঘাতে নিশ্চিহ্ন মাইলাই গ্রাম, কেন দিনের পর দিন ভিয়েতনামের বীর জনতার উপর অভব্য আক্রমণ। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের অবিনাশী সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এবং ডাকসুর যৌথ মিছিল গগনবিদারী স্লোগানে প্রকম্পিত করছে ঢাকার রাজপথ। সে চিৎকারে ভীত, কম্পমান মার্কিন সাম্রাজ্য; টলে উঠছে দেশে দেশে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের অন্যায়, অবিচার, হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ। আর মার্কিনের দালালরা স্লোগানের চাবুকে হচ্ছে দিশেহারা। স্লোগানের নেতৃত্ব কাদেরের। যে কাদের শোষণহীন সমাজ নির্মাণের ব্রত নিয়ে ভর্তি হয়েছে ঢাকা কলেজে। কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন মনোনীত ধর্ম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক। সাম্রাজ্যবাদের অহংকারকে মিথ্যায় পরিণত করতে, ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারকে বাংলার ছাত্র-জনতার অভিবাদন পৌঁছে দিতে কাদেরের কণ্ঠ উচ্চকিত। আচমকা সাম্রাজ্যবাদের অনুগতদের হুঁঙ্কার, বিনা উস্কানিতে পুলিশের গুলি। কাদেরের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ছাত্রহত্যায় শহীদ হলেন ১৬ বছরের এক দুরন্ত স্বপ্ন, মির্জা কাদেরুল ইসলাম। সাথী হলেন শোষণমুক্তির সমাজের স্বপ্নদ্রষ্টা আরেক যোদ্ধা মতিউল ইসলাম। মির্জা কাদের ১৯৫৭ সালে (১৭ পৌষ, ১৩৬২ বাংলা) জন্মগ্রহণ করেন। সাংগঠনিকভাবে অসম্ভব দক্ষ এ মেধাবী বালকটির শোষণমুক্ত সমাজ নির্মাণের স্বপ্নের সাথে পরিচয় ঘটে 'রঙধনু' খেলাঘরের মাধ্যমে। মাত্র ২-১ বছরের মধ্যে কুলাউড়ায় 'রঙধনু'র বিস্তৃতি ছড়ায় দুরন্ত গতিতে, নেতৃত্বে মির্জা কাদের। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বইপড়া, নাটকে এমনকী চাঁদা তোলায় অপ্রতিরোধ্য এ বালকটি পড়াশোনায়ও ছিল মেধাবী। স্কুলজীবনে প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম তিনজনের মধ্যেই তাঁর অবস্থান থাকত। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। '৭৩ সালে মির্জা কাদের উচ্চমাধ্যমিক প্রথম বর্ষের ছাত্র। অসাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, ছাত্র অধিকার আদায়ের অপ্রতিরোধ্য সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নীল পতাকার মাঝেই কাদের খুঁজে পেয়েছিল তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনদর্শন। ১ জানুয়ারির আগ পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত সংগঠন বিস্তারে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। ভিয়েতনামে মার্কিনিদের অন্যায় আগ্রাসন প্রতিরোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কাদের সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় কলেজের ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করেছেন বহুবার। '৭৩ এর ১ জানুয়ারি কাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার লড়াইয়ে ইতিহাসে পরিণত হন। ২০০০ সালে সার্বভৌম ভিয়েতনাম রাষ্ট্র এ আত্মদানের ঘটনায় মির্জা কাদেরুল ইসলামকে 'ভিয়েতনামের জাতীয় বীর' হিসেবে ঘোষণা দেয়। কাদেরের কণ্ঠ এখনো সোচ্চার। যেখানে সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র নখর পেখম মেলছে, কাদেরের প্রতিবাদী কণ্ঠ শোষিতের সাথে একাত্ম হচ্ছে। মতিউল-কাদেরের সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ পর্যন্ত, মানবমুক্তির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। লাল সালাম মির্জা কাদেরুল ইসলাম। তোমার রক্তপতাকা হাতে আমরা চলি অবিরাম।

শহীদ সুজন মোল্লা

শহীদ সুজন মোল্লা ১৯৭৭ সালের অক্টোবরে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুহিব মোল্লা, মা সাকিরা বেগম। উভয়ই পেশায় নির্মাণ শ্রমিক। মেধাবী ছাত্র সুজন স্থানীয় মধুরানাথ পাবলিক স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাশ করে ১৯৯৮ সালে বরিশাল পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট-এ প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। সুজনের স্বপ্ন ছিল শোষণমুক্ত সমাজের, যেখানে স্বাধীনভাবে মানুষ বসবাস করতে পারবে। থাকবে না কোন অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ। তাই অনিবার্যভাবেই সুজন স্থানীয় মাদক বিরোধী আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন, পাশাপাশি যোগ দেন মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নে। ১৯৯৮ সালে বরিশাল শহরের নতুন বাজার এলাকায় মাদকদ্রব্যের অবৈধ কেনাবেচা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যায়। স্থানীয় তরুণরা মাদকাসক্তির মরণ ফাঁদে ক্রমশই জড়িয়ে যায়। তাই স্থানীয় জনগণ মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মাদকের অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টির একটি মাধ্যম ছিল রিক্শার মাধ্যমে মাইকিং করা। দিনটি ছিল ১৬ জানুযারি। বরিশাল সদর রোডে অশ্বিনীকুমার হলের কাছাকাছি সুজনের মাইকিং রিকশা। হঠাৎ আসা ঘাতকের বুলেটে লুটিয়ে পড়লো একুশে পা দেয়া দূরন্ত তরুণ। প্রতিবাদে উত্তাল হলো বরিশাল এবং ক্রমশ সারাদেশ। গুরুতর অবস্থায় বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাকে। কিন্তু তিন দিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে ১৯ জানুযারি থেমে যায় সুজন মোল্লার প্রাণবন্ত জীবন।

শহীদ মোজাম্মেল হক

১৯৬৫ সাল (নভেম্বর-ডিসেম্বর) মাসে দিনাজপুর পৌরসভা নির্বাচনে ছাত্ররা আইয়ুব খানের সমর্থক মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমর্থকদের ভোট প্রদানের পক্ষে কাজ করছিল। তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের একটি প্রচার মিছিল দিনাজপুর শহরে প্রদক্ষিণকালে মুসলিম লীগের গুণ্ডারা মিছিলের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এই হামলায় মোজাম্মেল হক, মকবুল হোসেন, ফজলুর রহমান সহ আরো অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হয়। আহতদের সকলেরই পেটের নিচে ছুরি দিয়ে কেটে দেয়া হয়। আহতদের প্রায় সকলেই দীর্ঘ চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠে। কিন্তু ছাত্র নেতা মোজাম্মেলের অবস্থা ক্রমাবনতী হতে থাকলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ঢাকা মেডিকেলে দীর্ঘ একমাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ৩০ জানুয়ারি থেমে যায় একটি প্রাণবন্ত জীবন। শহীদ মোজাম্মেল হকের মৃত্যুর পর ছাত্র ইউনিয়ন 'শহীদ মোজাম্মেল হক' নামে ভলিবল টুর্নামেন্ট চালু করে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু পর্যন্ত প্রতি বছর এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতো।

শহীদ ওলিউর রহমান

খুলনা সিটি কলেজে াতক শ্রেণির নৈশ বিভাগের ছাত্র ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের এ মেবাধী সংগঠক। শ্রমিকদের মুক্তির জন্য সবসময়ই তিনি ভাবতেন। ভাবতেন একটি শোষণহীন সমাজের কথা। থাকতেন খুলনা সংলগ্ন খালিশপুর শিল্পাঞ্চলের মিল ব্যারাকে। ১৯৭১-এর দুঃসহ দিনগুলির প্রথম দিকেই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এ দেশীয় দালালদের সহযোগিতায় ওলিউর রহমানকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়।

শহীদ বিপ্রদাশ রায়

বিপ্রদাশ স্বপ্ন দেখতেন সমাজ বদলের সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের। চেয়েছিলেন দুঃখী মা বোনের মুখে হাসি ফোটাতে। তাই খুলনা জেলা সিপিবি'র সাথে এসেছিলেন ২০০১ সালের ২০ জানুয়ারী পল্টন ময়দানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)'র লাখো জনতার মহাসমাবেশ। চোখে মুখে স্বপ্নের ঝিলিক নিয়ে মিছিল করেছেন তপ্ত রোদ্দুরে কালো রাজপথে। ঘর্মাক্ত দেহে নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন সমাবেশের বক্তৃতা। কিন্তু তার স্বপ্নকে রুদ্ধ করতে বিস্ফোরিত হয় কাপুরুষ ঘাতকদের রেখে যাওয়া বোমা। মূহুর্তেই হিমাংশু, মজিদ, হাশেমের মোক্তারের রক্তে লাল হয়ে যায় পল্টনের মাটি। আহত হন আরো অনেকে। বিপ্রদাশও মারাত্মকভাবে আহত হন। বোমার স্প্লিন্টার তাঁর বাম ফুসফুসের ওপরের অংশে আঘাত হানে। তাকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এরপর রাতে স্থানান্তর করা হয় মহাখালির বক্ষব্যাধি হাসপাতালে। বিপ্রদাশ লিপ্ত হন মৃত্যুর সাথে লড়াইয়ে। ডাক্তাররা দ্রুত তাঁর ফুসফুসে অস্ত্রোপচার করেন। কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেন তিনি। কিন্তু ২৯ জানুয়ারি থেকে আবার তার অবস্থার অবনতি হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ২ ফেব্রুয়ারি তিনি হার মানেন মৃত্যুর কাছে।

২০ বছরের টগবগে তরুণ বিপ্রদাশ ছিলেন খুলনা বিএল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের নেতা, পড়তেন অর্থনীতির ১ম বর্ষে। তাঁর জন্ম বাগেরহাট জেলার মোংলার কাপালিরমেঠ গ্রামে তাঁর বাবার নাম নিরোদ বিহারী রায়, মাতার নাম সবিতা রায়। ১৯৯৭ সালে দিগরাজ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে থেকে দ্বিতীয় বিভাগে মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর ১৯৯৯ সালে বাজুয়া এস এন কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর ভর্তি হন বিএল কলেজের অর্থনীতি বিভাগে।

যেকোন আন্দোলন সংগ্রামে বিপ্রদাশ থাকতেন মিছিলের পুরোভাগে। হাসপাতালে আহত বিপ্রদাশ বলেছিলেন 'আমি আবারো রাজপথে আসব, আমি মিছিলে আসব, আবার আসব।' বিপ্রদাশের আর মিছিলে আসা হয়নি। কিন্তু বিপ্রদাশ জানেন 'এক বিপ্র লোকান্তরে লক্ষ বিপ্র মিছিল করে।'

শহীদ মোস্তফা হাসান আকন্দ

আবু মোঃ রশিদ ও মোজেদা আক্তারের ছেলে মোস্তাফা কামাল কিশোরগঞ্জ জেলার একজন প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় দেশের অভ্যন্তরে থেকেই মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭১ সালের ৭ নভেম্বর পাকিস্তানী বাহিনী ও রাজাকাররা মোস্তফা কামালের বাড়ির পাশের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে লুকিয়ে থাকে। মোস্তফা স্থানীয়দের নিয়ে আগুন নিভাতে গেলে পাক হানাদাররা ব্রাশ ফায়ার করে। ঘটনাস্থলেই মোস্তফা হাসান আকন্দ শহীদ হন।

শহীদ সারোয়ার খান মুরাদ

১৯৯০ সাল। শহীদ মুরাদ ঢাকার লালবাগের সালেহা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র। ছাত্র ইউনিয়ন লালবাগ শাখার নেতা সারোয়ার খান মুরাদ। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের উত্তাল শেষ সময়। প্রায় এক দশক সামরিক আইনের বলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে রুদ্ধ করে রাখে জেনারেল এরশাদ। সমগ্রদেশ প্রতিবাদ মুখর। এই সময় ছাত্র ইউনিয়ন আহূত স্বৈরাচার বিরোধী নানা আন্দোলনের কর্মসূচিতে পরিচিত মুখ ছিল সারোয়ার খান মুরাদ। মুরাদের মুখ দিয়ে প্রায় সময় উচ্চারিত হতো, 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' বিপ্লবী শ্লোগান। স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদ এই আন্দোলন দমন এবং নিজের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য বেছে নেয় হত্যা-নির্যাতনের পথ। রাজধানী ঢাকায় স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে ২ ডিসেম্বর লালবাগের সেকশন পুলিশ ফাঁড়ি থেকে পিলখানার দিকে বিপ্লবী এক মিছিল যেতে থাকে। সারোয়ার খান মুরাদ অধীর আগ্রহ নিয়ে কিছুক্ষণ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে মিছিলে যুক্ত হন। মিছিলে স্বৈরাচার বিরোধী স্লোগান উচ্চারণ করে দীপ্ত শপথে। এমন সময় রাষ্ট্রীয় পেটুয়া বাহিনী বি. ডি. আর (বর্তমান বি. জি. বি) পিলখানার ভিতর থেকে মিছিলকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। মুহূর্তে লুটিয়ে পড়েন মুরাদ। স্বৈরাচার বিরোধী স্লোগান ধারণ করতে গিয়ে শহীদ হন সারোয়ার খান মুরাদ। মুহূর্তেই এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে। গড়ে উঠে দুর্বার স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন।

শহীদ মুরাদের মত অসংখ্য শহীদের অসমাপ্ত লড়াই এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। শহীদের স্বপ্ন বৃথা যেতে পারে না।

শহীদ খায়রুল জাহান

পিতা আবদুল হাই তালুকদার ও মাতা বেগম সামছুন নাহারের ঘরে খায়রুল জাহান ১৯৫০ সালের ১৫ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। গুরুদয়াল কলেজে পড়ার সময় তিনি ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৮ জুলাই তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে ২নং সেক্টরের গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২৬ নভেম্বর ১৯৭১ সালে প্যারাভাঙ্গা নামক স্থানে পাক হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের সাথে সম্মুখ সমরে তিনি শহীদ হন। মুক্তিযুদ্ধের পরে তিনি বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত হন।

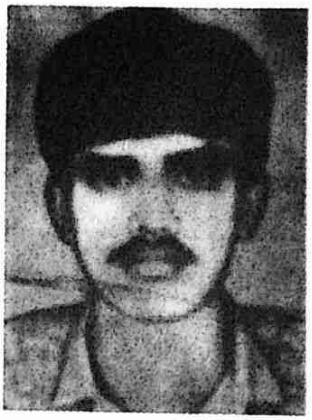

শহীদ গোবিন্দ সাহা

শহীদ গোবিন্দ ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে কুড়িগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বটেশ্বর সাহা, মা জোৎস্না রাণী সাহা। গোবিন্দ নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে যুক্ত হন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হবার পর গোবিন্দ উলিপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ে বাণিজ্য শাখায় ভর্তি হন। ১৯৯৩ সালে তিনি কলেজ শাখার প্রচার সম্পাদক ছিলেন। সেই সময় জিয়াউর রহমান ও এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে উলিপুরের ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে তোলে দুর্বার আন্দোলন। কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে মূল পদে ছিল ছাত্র ইউনিয়ন নেতা-কর্মীরা। কলেজের ছাত্রদের কাছে ছাত্র ইউনিয়নের গ্রহণযোগ্যতা ছিল অনেক বেশি। এরশাদের অনুসারী ছাত্ররা ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সাথে মিলিতভাবে কলেজে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল। তাই কলেজের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল ছাত্র ইউনিয়ন। ফলে তারা মরিয়া হয়ে উঠে ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীকে প্রতিহত করতে। ১৯৯৩ সালের ২/৩ ফেব্রুয়ারি কলেজে ছাত্রলীগের গুণ্ডারা হামলা চালায় ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীদের উপর। সন্ত্রাসীরা এখানেই থেমে থাকেনি। ৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় তাঁর মা জোৎস্না রাণী সাহা অসুস্থ হয়ে পড়লে ঔষধের জন্য গোবিন্দ উলিপুরের ঔষুধের দোকানে যায়। কিন্তু ঔষধ কিনে ফেরার পথে সন্ত্রাসীরা গোবিন্দের উপর নৃশংস হামলা চালায়। অজ্ঞান অবস্থায় উলিপুর হাসপাতালে নেয়া হয় তাকে। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে রংপুর মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু ৫ ফেব্রুয়ারি অত্যধিক আঘাতের কারণে মৃত্যুবরণ করেন গোবিন্দ সাহা।

শহীদ ফজলুর রহমান

স্কুলে পড়ার সময় ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেন। গুরুদয়াল কলেজে পড়ার সময় সেখানে গড়ে তোলেন একটি শক্তিশালী সংগঠন। '৬৯ ও '৭০-এর উত্তাল দিনগুলোতে তিনি পালন করেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ১৯৭০ সালের বি. এ পাশ করার পর একাত্তরের জানুয়ারিতে যোগ দেন একটি হাই স্কুলে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সব ফেলে চলে যান মুক্তিযুদ্ধে। কিশোরগঞ্জের কুখ্যাত রাজাকার মুসহলে উদ্দিন আটক অবস্থায় কিশোরগঞ্জের সিদ্ধেশ্বরী ঘাঁটে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। শহীদ ফজলুর রহমান ছাত্র ইউনিয়ন মহকুমা কমিটির সভাপতি ছিলেন। তার মায়ের নাম আমেনা খাতুন ও বাবার নাম মৌলভী আবদুল আজিজ। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট আতকগাড়া, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন।

শহীদ জিল্লুর মোরশেদ মিঠু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জিল্লুর মোরশেদ মিঠু ছাত্র ইউনিয়নের হল, বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্র প্রতিটি পর্যায়েরই নেতা-কর্মীদের কাছে ব্যাপক পরিচিত ছিলেন। প্রচণ্ড সাহসী মিঠু অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব সময়েই ছিলেন সোচ্চার। মুক্তিযুদ্ধের সময় ৭১ সালের আগস্টে ধানমন্ডি থেকে গ্রেফতার হন। ১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর তিনি বাসা থেকে বের হন। তারপর আর ফিরে আসেননি।

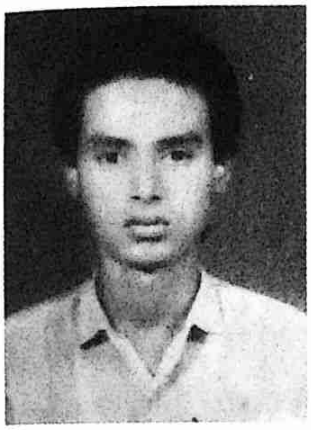

শহীদ তপন সরকার

শহীদ তপন সরকার ১৯৭০ সালে মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার দর্শনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সুরেন্দ্র নাথ সরকার, মা পুষ্প রানী সরকার। তপন কলেজ জীবন ১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীতে শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৯০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত রসায়ন বিভাগে ভর্তি এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হন। ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৯৯০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা বিরোধী চক্র ছাত্র শিবিরের আক্রমণে মেধাবী তপন শহীদ হন। উল্লেখ্য, সেই সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নের অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ৬ই ফেব্রুয়ারি ছাত্র শিবির ক্যাম্পাসে রক্তের খেলায় মেতে উঠলে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক চক্র শিবির সেই মিছিলেও হামলা চালায়। হামলার এক পর্যায়ে ঘাতক শিবির কর্মীরা তপনকে সামনাসামনি পেয়ে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে তাঁর মাথায় নৃশংসভাবে আঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। সংগঠনের নেতাকর্মী সহযোদ্ধা সবাই এগিয়ে আসে তাঁর জীবন রক্ষায় কিন্তু অত্যাধিক রক্তক্ষরণে ভোর ৫টায় তপন মৃত্যুবরণ করেন।
শহীদ তপন যে বিদ্যালয়ে স্কুল জীবন কাটিয়ে ছিলেন সেই দর্শনা উচ্চ বিদ্যালয়ে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়।

শহীদ জসীম উদ্দিন আহমদ

১৯৫৫ সালে সন্দ্বীপের মাইটভাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায়ই ছাত্র ইউনিয়নের সাথে জড়িত হন। এপ্রিলের গোড়ার গোড়ার দিকে সন্দীপ থানা পুলিশ অন্যায়ভাবে মাইটভাঙ্গার হুরি কর্মকারকে বন্দি করেন। থানায় নিয়ে যাওয়ার পথে জসিম পুলিশের গতিরোধ করেন। পুলিশের দল পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। এর কিছুদিন পর স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীরদের সহযোগিতায় অতর্কিত হানা দিয়ে পুলিশ জসিম এবং শফিকুল মাওলাকে বন্দি করে সন্দ্বীপ থানায় নিয়ে যায়। নভেম্বরের দিকে তিনি আলবদর রাজাকার বাহিনীর হাতে পুনরায় বন্দি হন। তাকে চট্টগ্রামের কুখ্যাত ডালিম হোটেলে নিয়ে যাওয়া যায়। তার উপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালানো হয়। নভেম্বরের শেষের দিকে তিনি ডালিম হোটেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শহীদ রহিম বক্স খোকা

ছাত্রাবস্থায় ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল হঠাৎ মাইন বিস্ফোরণে ধ্বসে পড়ে স্কুল ভবন। অসংখ্য বীর মুক্তিযোদ্ধার সাথে রহিম বক্স শহীদ হন।

শহীদ নুরুল ইসলাম

শহীদ নুরুল ইসলাম ১৯৬৯ সালে রাজশাহী সিটি কলেজের একাদশ শ্রেণীর বাণিজ্য শাখার ছাত্র। পাশাপাশি শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্নে যুক্ত হন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নে। সে সময় আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ উত্তাল সমগ্র দেশ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তি। ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি সহ ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলনের প্রতিবাদী নাম ছাত্রনেতা নুরুল ইসলাম খোকা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক কে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি অবস্থায় হত্যা করে বলা হয় তিনি পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। পাক হানাদারের এই কূটকৌশলে ছাত্র জনতা বিভ্রান্ত না হয়ে হত্যার প্রতিবাদে সমগ্র দেশে ১৬ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালন করে। সারা দেশের মতো রাজশাহী জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। পাশাপাশি বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নেমে আসে রাজপথে। শাসক গোষ্ঠী ভীত হয়ে রাজশাহীতে ১৪৪ ধারা জারি করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নেয় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল শহরের দিকে যাবে। শহরেও শুরু হয় কারফিউ ভাঙ্গার প্রস্তুতি। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্রদের মিছিল শুরু হলে পাক সেনারা মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। মিছিলে পাকসেনাদের গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রক্টর ড. সামসুজ্জোহাকে প্রাণ দিতে হয়। একজন শিক্ষকের এভাবে মৃত্যুর ঘটনায় ফুঁসে ওঠে শহরবাসী। এই সময় পাক সেনারা শিক্ষকদের গ্রেফতার করে খোলা আর্মি ট্রাকে তৎকালীন পৌরসভা ভবনের ক্যাম্পে নিয়ে আসে। শহরের মোড়ে মোড়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্র নেতারা ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। সে সময় ছাত্রনেতা নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে মিছিল পৌরসভা ভবনের কাছাকাছি আসতে থাকলে পৌরসভা ভবনে অবস্থানরত ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস- ইপিআর এর জোওয়ানদের গুলিতে নগরীর সোনাদিঘীর মোড়ে শহীদ হন মিছিলের অগ্রভাগে থাকা ছাত্রনেতা নুরুল ইসলাম।

শহীদ কাজল পাল

১৯৫৫ সালের ২ আগস্ট দীনেশ পাল ও শতদল বামিনী পালের ঘরে সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র আন্দোলনের এক সক্রিয় কর্মী কাজল পাল ১৯৭১ সালে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জীবন বাজি রেখে রণাঙ্গনে লড়াই করেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এরপর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধার সাথে। মৌলভীবাজারের একটি সরকারি স্কুলে অবস্থান নেন। ২০ ডিসেম্বর হঠাৎ মাইন বিস্ফোরণে স্কুলের ভবন ধ্বসে পড়লে অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাজল পালও শহীদ হন।

শহীদ নাসিরুজ্জামান ননী

খুলনা সিটি কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন নাসিরুজ্জামান ননী। ১৯৭১ সালের এপ্রিলের প্রথম দিকে পাকিস্তানী বাহিনী অতর্কিত তার বাসায় হামলা চালিয়ে আটক করে নাসিরকে। কয়েকদিন নির্যাতনের পর তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। গুলি করেই ক্ষান্ত হয় নি বর্বর পাক হায়েনারা, শহীদ নাসিরুজ্জামানের লাশ ঝুলিয়ে রাখে জনসম্মুখে।

শহীদ তাজুল ইসলাম

মুখোমুখি লড়াইয়ে মৃত্যু গৌরবের, কিন্তু যে জীবন মৃত্যুর তরে উৎসর্গীকৃত, যে জীবন আরো অসংখ্য জীবনকে বাঁচার স্বপ্ন শেখায় সে জীবনকে কী দিয়ে মাপা যাবে। তাজুল একটি অনুপ্রেরণার নাম, সারা বাঙলা খুঁজে আর একটি পাওয়া যাবেনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে শোষণ বঞ্চণাহীন সমাজ নির্মাণে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য চাকরি নিয়েছিলেন আদমজীতে, বদলি শ্রমিক হিসেবে। পারিবারিক সকল সুবিধাদি তুচ্ছ করে, স্ত্রী-সন্তানসহ পুরো এক দশক কাটিয়েছিলেন শ্রমিকদের সাথে শ্রমিকপল্লীতে। সুবিধাবাদী জীবনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বেছে নিয়েছিলেন সম্মানের জীবন, ইচ্ছে করলেই বাস্তবতার অজুহাতে পাশ কাটাতে পারতেন, কিন্তু ছাত্র ইউনিয়নের কাছ থেকে যে দীক্ষা অর্জন করেছিলেন তার প্রতি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন অবিচল। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেছিলেন, ছিলেন আদমজী ট্রেড ইউনিয়নের সহ-সভাপতি, পাটকল ট্রেড ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক সম্পাদক। বাংলা ১৩৫০ সালে চাঁদপুরের মতলবে জন্মগ্রহণ করেন। ৭ম শ্রেণীর ছাত্র থাকতেই যোগ দেন ছাত্র ইউনিয়নের পতাকাতলে। ১৯৬৮ সালে ঢাকা কলেজ থেকে ১ম বিভাগে এইচ এস সি পাশ করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে। ছাত্র সংগঠনের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন, অভিভাবকেরা তাকে ছাত্র ইউনিয়ন থেকে ফেরাতে বিয়ে করিয়ে দেন। বিয়ের রাতেই চাঁদপুর ছেড়ে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় সম্মেলনের কাজে অংশগ্রহণের জন্য। ১৯৭৩-৭৪ সালে নির্বাচিত হন কেন্দ্রীয় সংসদের প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ শেষে মেহনতি শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র ও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। নিছক বিপ্লব রোমন্থনের জন্য নয়, তিল তিল করে সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আদমজীর শ্রমিক পল্লীতে কাটিয়েছেন ১০ বছর। তাজুল ইসলাম এবং তাঁর সহযোদ্ধাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে স্বৈরাচারী এরশাদের বিপক্ষে শ্রমিকরা হয়ে ওঠে আন্দোলনের প্রধান চালিকাশক্তি। শ্রমিক আন্দোলনের সে স্বর্ণোজ্জ্বল সময়ে আদমজীসহ সমগ্র ঢাকা অঞ্চলের শ্রমিক বেল্টে তাজুল আবির্ভূত হন স্বৈরাচারী এরশাদশাহীর অন্যতম বিপদ হিসেবে। ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) দাবি আদায়ে হরতাল আহবান করে। হরতাল সফল করতে সমস্ত প্রস্তুতি শেষে বাড়ি ফিরছিলেন বিপ্লবের এ মহানায়ক। পথিমধ্যে স্বৈরাচারের পেটোয়া গু-াবাহিনী তাজুলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাতের কালো আঁধার বিপ্লবের এ লালফুলকে চিরতরে কেঁড়ে নেয়। এ মহান বিপ্লবী তার উত্তরসূরীদের জন্য রেখে গেছেন ইতিহাস হবার আহ্বান। তাজুলের আত্মত্যাগ, বিপ্লবের প্রতি অবিচলতা ছাত্র ইউনিয়নের আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। প্রমাণ করেছে বিপ্লবী ধারার ছাত্র আন্দোলনই এদেশে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের মুক্তির সহায়ক। নীল পতাকার হে মহান সৈনিক, বিপ্লবের লাল ফুল-তাজুল ইসলাম; তোমাকে সংগ্রামী অভিবাদন। তোমার আদর্শ, অনুপ্রেরণা হয়ে ছড়িয়ে পড়ুক বাংলার প্রতিটি ঘরে। তোমার রক্তপতাকা হাতে আমরা চলি অবিরাম।

শহীদ মঈন হোসেন রাজু

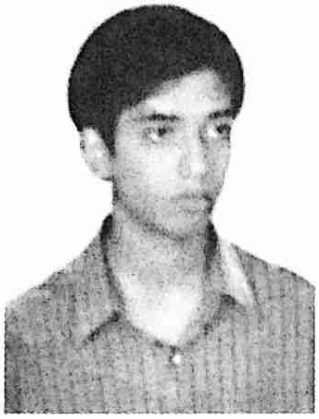

স্বপ্ন আমার সাগর দোলার ছন্দ চায়, অশুভ'র সাথে আপোষহীন দ্বন্দ্ব চায়.... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্তরে যে ভাস্কর্য মাথা উঁচু করে জানান দিচ্ছে, অন্যায় যত শক্তিশালী হোক না কেন, পরাজয় তার অবশ্যম্ভাবী; সত্য আর ন্যায়ের বিজয় অবশ্যম্ভাবী সে ভাস্কর্যটি রাজুকে ধারণ করে আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী রাজু জানান দেবে, মৃত্যু তাঁকে কেড়ে নিতে পারলেও তাঁর শুভ্র আদর্শের মৃত্যু নেই, তাঁর গৌরবের নীল পতাকার বিনাশ নেই। মৃত্যুঞ্জয়ী এ বীর সেনা জন্মেছিলেন ১৯৬৮ সালের ২৯ জুলাই। শেরেবাংলা নগরে ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে তোলার ভেতর দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির সাথে তার যোগাযোগ। ছিলেন তেজগাঁও থানা কমিটির সদস্য। '৮৭ সালে উচ্চমাধ্যমিক সম্পন্ন করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে। স্বৈরাচারবিরোধী ছাত্র গণআন্দোলন তখন তুঙ্গে। জীবনবাজি রেখে স্বৈরাচারের পতন ঘটাতে যারা শিক্ষাঙ্গন, হাটে-মাঠে-ঘাটে তৎপর ছিলেন, রাজু ছিলেন তাদেরই একজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ মৃত্তিকা, অফুরন্ত সম্ভাবনা তাকে স্বপ্ন দেখায়। তাইতো সবুজ আঙ্গিনায় অস্ত্রের দাপট তিনি মেনে নিতে পারেননি। ক্যাম্পাসে তখনো ছিল অস্ত্রের ঝনঝনানি। এ সন্ত্রাসের বিপক্ষে ছাত্র ইউনিয়ন ছিল প্রতিবাদমুখর। সংগঠনের কাজকে তৃণমুলে ছড়িয়ে দিতে সদাকর্মব্যস্ত ছিলেন মেধাবী এ ছাত্রনেতা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থী এবং ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মী, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার স্বপ্ন ধারণ করে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'প্রজ্ঞা'। '৯১ সালে শহীদুল্লাহ হল কমিটি ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভ করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্যও হয়েছিলেন। মেধাবী এ সন্তানকে ছিনিয়ে নেয় সন্ত্রাসীর বুলেট। '৯২ সালের ১৩ই মার্চ। টিএসসি জুড়ে চলছিল ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের গোলাগুলি। টিএসসির রেলিং-এ বসা রাজু তার পাশে থাকা কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে এ সন্ত্রাস-গোলাগুলির প্রতিবাদ করে ওঠে। ছাত্র ইউনিয়নের আদর্শিক জোট গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের এ মিছিলেও গুলি চালায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা। গুলি মিছিলের সামনে থাকা রাজু'র কপাল ভেদ করে চলে যায়। রাজুর মৃত্যুর পর শামসুর রাহমান লিখলেন, 'না রাজু, আমরা এভাবে তোমাকে ঘুমাতে দেব না.. ..', ক্যাম্পাসের দেয়ালগুলো গমগমিয়ে উঠল, 'যে যুবক ঘৃণা করেনা রাজুর হিংস্র ঘাতকদের 'সে অমানুষ'। রাজু হয়ে উঠল ইতিহাস। নীল পতাকার অভিযাত্রী রাজুর এ আত্মদান মহাকাল স্মরণ করবে। শহীদ মঈন হোসেন রাজু তোমার রক্তপতাকা হাতে আমরা চলি অবিরাম।

শহীদ রেজাউল করিম নতুন

কুড়িগ্রাম জেলার সদর থানার মোগলবাসা ইউনিয়নের বৈরাগীর বাজার নামক এলাকায় ১৯৭০ সালে নতুনের জন্ম। তাঁর পিতা ফেরদৌস আলী, মা শামছুন নাহার বেগম। শহীদ নতুন নীলারাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে মেধার ভিত্তিতে কুড়িগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে (জেলা স্কুল) ভর্তি হন। কুড়িগ্রাম সরকারি মহাবিদ্যালয় ও শহীদ নতুনের স্কুল ছিল পাশাপাশি। কুড়িগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর থেকে নতুন প্রতিদিন দেখেছে কলেজের ছাত্ররা সামরিক শাসন ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মিছিল করে। মিছিল হলে স্কুলের ছেলেদের সাথে নতুনও মিছিলে অংশ নিত। নতুন বুঝতে পারতো জেনারেল এরশাদ একজন নরপশু, সে ছাত্রদের হত্যা করেছে, ছাত্ররা সে কারণেই এরশাদের বিরুদ্ধে মিছিল করে। দখলদারিত্ব, সন্ত্রাস, পেশি শক্তির মহড়া রেজাউল করিম নতুন মেনে নিতে পারেনি। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্যে নতুন ছাত্র ইউনিয়নে যুক্ত হয়। তাঁর আগ্রহ ও নিষ্ঠার কারণেই কুড়িগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় স্কুল কমিটিতে তাঁকে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়। এছাড়া সে কৃষ্ণপুর বকসী পাড়া আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক হয়। সে সময়টা ছিল স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামের সময়। স্কুলের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও নতুন প্রায় প্রতিদিন মিছিলে অংশ নিত। তাই সে ছাত্রনেতা হিসেবে সে সময় পরিচিতি পায়। সে সময় কুড়িগ্রামে স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রামে মূখ্য ভূমিকা পালনকারী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নের অবদান ছিল অন্যতম। এ কারণে ছাত্র ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ছিল স্থানীয় জাতীয় পার্টি। জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী কুড়িগ্রাম শান্তি কমিটির সভাপতি পাকহানাদারদের দোসর অ্যাড. আলহাজ্ব পনির উদ্দিন আহমেদের পুত্র বিশিষ্ট দালাল এরশাদের মন্ত্রী তাজুল ইসলাম চৌধুরী। কুড়িগ্রামে তাজুল চৌধুরীর ছত্রছায়ায় স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি সংগঠিত হতে থাকে। আর তাজুল চৌধুরীর বিশেষ ক্ষোভ ছিল ছাত্র ইউনিয়নের প্রতি। পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালের ১৯ মার্চ কুড়িগ্রাম জেলা সদরে সমগ্র জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা 'শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন'-এর ব্যানারে জামায়াত-শিবির প্রকাশ্য মিছিল করে। সেদিন রেজাউল করিম নতুন তাদের মিছিলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মিছিলে থাকা নতুনের বাড়ির এলাকার জামায়াত শিবিরের কয়েকজন নতুনকে দেখে বলে 'ঐ যে কাদের ধর ধর' বলে ধাওয়া করলে নতুন কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজের শিক্ষকদের আবাসিক কোয়ার্টারে ঢুকে পড়ে। জামায়াত শিবির ক্যাডাররা শিক্ষকদের বাসভবনে ঢুকে নতুনকে টেনে হেঁচড়ে বের করে এনে কলেজের ছেলেদের কমনরুমের কাছে লাঠি ও বিভিন্ন অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করে। রেজাউল করিম নতুনের মৃত্যুর খবর শহরে ছড়িয়ে পড়লে হাজারো ছাত্র-জনতা সেদিন জামায়াত শিবিরের বিরুদ্ধে মাঠে নামলে জামায়াত শিবিরের ক্যাডাররা শহর থেকে পালিয়ে যায়। প্রশাসন সেদিন শহরে কারফিউ দিয়ে জনতার প্রতিবাদ বন্ধ করার চেষ্টা করলেও ছাত্র-জনতা কারফিউ উপেক্ষা করে রাজপথে লাশ নিয়ে মিছিল করে। পরের দিন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে লাশ রাখা হলে শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্ররা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। সেদিন প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মতো মানুষ সমবেত হয়েছিল। নতুনকে মারার কারণে একাত্তরের কুখ্যাত আলবদর জামায়াত নেতা আব্দুল হামিদ, কুড়িগ্রাম আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হক, রাজারহাট

মীর ইসমাইল কলেজের অধ্যাপক লিয়াকত আলী, শবেবর রহমান, বড়বাড়ী কলেজের ডেমোনস্ট্রেটর সফিসহ অনেকের বিরুদ্ধে মামলা হয়। মামলাটি প্রমাণিত হওয়ার পরেও শুধু সন্দেহের কথা বলে আসামীদের খালাস দেয়া হয়।

শহীদ রেজাউল করিম নতুনের হত্যার বিচার হয়নি। নতুনের মৃত্যু এ জনপদে প্রতিক্রিয়াশীলদের চলাকে শ্লথ করে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় দেড় দশক কুড়িগ্রামে মৌলবাদীরা প্রকাশ্যে তাদের তৎপরতা চালাতে পারে নাই। শহীদ নতুনের স্বপ্ন ছিল আপোষহীন। বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক সমাজ ব্যবস্থা, সেই লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত, নতুন থাকবে চির নতুনের যাত্রায়।

শহীদ রওনাকুল ইসলাম বাবর

খুলনার দৌলতপুরে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে রওনাকুল ইসলাম বাবরের জন্ম। পিতা মরহুম মোঃ হানিফ দৌলতপুর মহসিন স্কুলের কৃতি শিক্ষক ছিলেন। স্কুলে পড়াকালীন তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হন। পরে এস. এস. সি পাশ করে ব্রজলাল কলেজে ভর্তি হলে নিজেকে ছাত্র রাজনীতিতে নিবেদন করেন। ১৯৬৮ সালে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন এবং ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একজন প্রথম সারির ছাত্র নেতা হিসেবে শুধু ব্রজলাল কলেজে নয় সারা খুলনা জেলার ছাত্রসমাজের কাছে পরিচিত হন। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা হওয়ার পর অন্যদের সাথে তিনিও দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। শুরুতে তৎকালীন ছাত্রনেতা মনিরুজ্জামানের সাথে সংগঠনের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা কর্মীদের ভারতে ট্রেনিং এর জন্য পাঠিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। দীর্ঘ কয়েকমাস এভাবে বাড়ি ছেড়ে কাজ করার পর ২৯ জুলাই তিন তার অসুস্থ পিতার সাথে দেখা করতে দৌলতপুরের বাড়িতে আসেন। স্থানীয় রাজাকার বাহিনী খবর পেয়ে হানাদারদের দিয়ে আটক করিয়ে স্থানীয় এক পান চাষীর বিল্ডিংয়ে আটকে রাখে। তার সঙ্গে আটক করে তার ছোট ভাই জাকির হোসেন ও ছাত্রনেতা তপন দাসকে।

সারাদিন নির্যাতনের পর সেদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় মহেশ্বরপাশা বিলে (বর্তমান কৃষি বিভাগের নার্সারি) তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে একবার বলা হয়, তুমি একবার পাকিস্তান জিন্দাবাদ বল, তোমাকে ছেড়ে দেব। বাবর পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলেন নি। তারপর প্রথম তার দুই হাত কেটে ফেলা হয় এবং এরপর দু'পা। পরে বেয়নেট দিয়ে চোখ উপড়ে ফেলা হয়। অবশেষে তাকে নির্মমভাবে জবাই করে হত্যা করা হয়। দেশ স্বাধীন হলে ঐ স্থানে তার কঙ্কাল পাওয়া যায় এবং সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়।

শহীদ আব্দুল হাই

শহীদ আব্দুল হাই ১৯৫৩ সালে আগস্ট মাসে নওগাঁয় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মো. ইউসুফ আলী মা জয়মন বিবি। আব্দুল হাই নওগাঁ মহকুমা ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য এবং নওগাঁ ডিগ্রি কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন। ১৯৭২ সালের ১ মে তিনি আততায়ীর গুলিতে শহীদ হন, তাঁর মৃত্যুর পর ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠে। এ আন্দোলন সরকার বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হওয়ার আশংকায় তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল ব্যাপক নির্যাতন চালিয়ে নেতাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়।

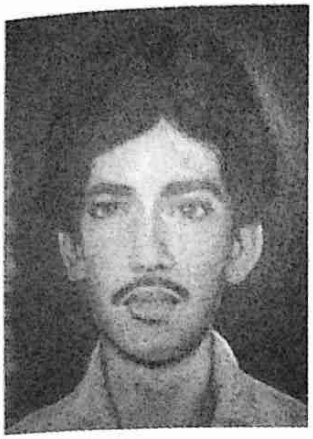

শহীদ মাজহারুল হক আসলাম

শহীদ মাজাহারুল হক আসলাম ১৯৬৬ সালের ১৪ আগস্ট কেরাণীগঞ্জ থানার রুহিতপুর ইউপির কামারতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ মোজাম্মেল হক। শহীদ মাজাহারুল হক আসলাম তিন বোনের একমাত্র ভাই। স্কুল জীবন থেকে আসলাম ছিলেন শান্ত সভ্য সদালাপী। শিক্ষকদের ভালোবাসা ও স্নেহ তাকে নতুন এক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। ১৯৮৫ সালে এসএসসি পাশ করার পর তার পরিবার ঢাকার মিরপুরে বসবাস শুরু করে। শহীদ আসলাম নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হন। স্কুল জীবন থেকেই আসলাম ভালো কিছু করার জন্য উদগ্রীব থাকতেন। শহীদ মাজাহারুল হক আসলাম মিরপুরের মনিপুর এরাকার ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হন। সেখানে খুব আন্তরিকতার সাথে সংগঠনের কাজে নিয়োজিত থাকতেন্ পাশাপাশি নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হন। সেখানে তিনি ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে এমনকি ক্লাস মিস করেও ছাত্র ইউনিয়নের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কলেজ শেষে মনিপুর এলাকায় সংগঠনের কাজ শেষ করে প্রতিদিন রাতে বাসায় ফিরতেন। থানা সংসদ থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সংসদের কাজে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলন সংগ্রামে মাঝে মাঝে অংশ গ্রহণ করতেন। প্রাত্যাহিক জীবনের প্রায় সবটুকু সময় সংগঠনের কাজে ব্যয় করতেন। ১৯৮৬ সালের ৩০ মার্চ। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়ে পতিত স্বৈরাচারের পোষা গুণ্ডাবাহিনীর একের পর এক অপকর্ম চালিয়ে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অস্থিতিশীল ও অগণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। অব্যাহত হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে ৩০ মার্চ বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ ঘোষণা করে ছাত্র ইউনিয়ন। বিক্ষোভ মিছিল চলাকালে স্বৈরাচারের গুণ্ডাবাহিনী ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে গুলি চালায়। এতে আসলাম গুলিবিদ্ধ হন এবং কিছুক্ষণ পর মারা যান। ঘাতকেরা হয়তো জানে না যে, আসলামদের মেরে নিঃশেষ করা যায় না। আসলামরা বেঁচে থাকে মুক্তির মন্দির সোপান তলে। বিপ্লবীদের আদর্শে চেতনায় কর্মে।

শহীদ মো. আনোয়ারুল ইসলাম

শহীদ আনোয়ারুল ইসলাম ১৯৫৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে নওগাঁয় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছোলাইমান আলী, মা সুলতানা বেগম, আনোয়ারুল ইসলাম নওগাঁ মহকুমা কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। ১৯৭২ সালের ১ মে আততায়ীর গুলিতে শহীদ হন। তাঁর মৃত্যুর পর ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠে। সরকার বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হওয়ার আশংকায় তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল ব্যাপক নির্যাতন চালিয়ে নেতাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়।

শহীদ শাহাদাত হোসেন সারু

শহীদ শাহাদাত ১৯৬৪ সালের ২৭ জুন নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী উপজেলার ঘোষ কামতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহব্বত আলী নৌবাহিনীর অফিসার। মা বেগম রোকেয়া। শাহাদাত ছোটবেলা থেকে বিনয়ী ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি ভাল ছবি আঁকতেন। তাঁর শখের মধ্যে ছিল বই পড়া, স্ট্যাম্প সংগ্রহ আর কবিতা আবৃত্তি করা। তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনী (চট্টগ্রাম) উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ১৯৮০ সালে বিদ্যালয়ের আলরাউন্ড বেস্ট পুরস্কার পেয়ে বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রের গৌরব অর্জন করেন। প্রতিবছর স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রায় পুরস্কার শাহাদাতের বাসায় জমা হতো। তিনি গান, কবিতা, ছবি আঁকা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৮২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে (১ম বিভাগে ৫টি লেটার মার্ক) উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে ভর্তি হন। চট্টগ্রাম কলেজ ইসলামী ছাত্র শিবিরের দখলে থাকা সত্ত্বেও শাহাদাত কলেজ জীবনেই বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হন। তিনি কলেজের সোহরাওয়ার্দী ছাত্রাবাস শাখার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

১৯৮৪ সালের ২৭ মে দিবাগত রাত সোয়া ৪টা অর্থাৎ ২৮ মে স্বাধীনতা-বিরোধী চক্র ছাত্র শিবিরের কর্মী হারুনুর রশীদ সোহরাওয়ার্দী ছাত্রাবাসের ১৫নং কক্ষে ১৭ বছরের শাহাদাতকে ঘুমন্ত অবস্থায় দা দিয়ে গলায় কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। শাহাদাতের হত্যাকারী পালিয়ে যাওয়ার সময় ছাত্রদের হাতে ধরা পড়লে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে মেজিস্ট্রেটের নিকট হারুনুর রশিদ তার অপরাধ স্বীকার করে জানায় যে, সে রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে পূর্ব পরিকল্পতিভাবে হত্যাকাণ্ড চালায় এবং এতে সহযোগিতা করে তার সংগঠনের রাজনৈতিক নেতারা। মৃত্যুর পরের দিন ছিল শাহাদাতের উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবহারিক পরীক্ষার শেষ দিন। শহীদ শাহাদাতের স্বপ্ন ছিল শোষণহীন, অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠার। ঘাতক চক্র চেয়েছিল এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তার স্বপ্নকে ভেঙ্গে দিতে। বিস্তৃত স্বপ্নের বল্গাহীনতায় ভীত হয়ে তারা রাতের অন্ধকারে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায়। ঘাতকেরা বরাবরের মত চোখে ঠুলি পরে ভুলে যেতে চেয়েছিল যে, শাহাদাত মৃত্যুবরণ করলেও তার স্বপ্ন ও আদর্শ মৃত্যুবরণ করবে না।

শহীদ মাহবুব উল আলম

১৯৫১ সালের ১০ই জুলাই বাথুয়া, মুরালীবাড়ী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম-এ জন্মগ্রহণ করেন। মাহবুর উল আলম রাঙ্গুনীয়া কলেজ শাখার সভাপতি ছিলেন ১৯৭০-৭১ সালে। চট্টগ্রাম সিটি কলেজের ছাত্র নেতা থাকার সময় তিনি ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং কারারুদ্ধ হন। ১৯৭১ সালের ২৭ জুলাই সন্ধ্যায় পাক বাহিনী তার বাসভবন ঘেরাও করে। তাকে না পেয়ে তারা চলে যায়। পরবর্তীতে তাকে আটক করে পাকিস্তানী বাহিনীর দালাল কুখ্যাত ফজলুল কাদের চৌধুরীর গুডস হিলের বাসভবনে নিয়ে যায় এবং অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয়। পরে তার লাশ গুম করে ফেলা হয়।

শহীদ প্রোটন কুমার দাশগুপ্ত

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের অগ্রসেনানী শহীদ প্রোটন দাশগুপ্ত ১৯৭৩ সালের ২২ মার্চ হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার স্বজূন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ডা. সুভাষ দাশগুপ্ত মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত গেরিলা বাহিনীর একজন মুক্তিযোদ্ধা। মা রেনুবালা দাশগুপ্ত। তিন ভাই এক বোনের মধ্যে প্রোটন দ্বিতীয়। লাখাই ১নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রোটন প্রাইমারি বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে মাধবপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, ১৯৯১ সালে সিলেট সরকারি বাণিজ্যিক কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। ১৯৯১-১৯৯২ সেশনে ঢাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগে ভর্তি হন। ছোট বেলা থেকে শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন লালন করার কারণে ঢাকায় ছাত্র ইউনিয়নের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হন। ১৯৯৬ সালে প্রোটন সংগঠনের জাতীয় পরিষদ সদস্য হন।

প্রোটন ছাত্র ইউনিয়ন লাখাই উপজেলার আঞ্চলিক শাখার সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৯৬ সালে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে লাখাই উপজেলার দুর্নীতিবাজ লোকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। সেই সময়ে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা প্রোটন দুর্নীতিবাজ লোকদের কাছে 'শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত হয়। এর প্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালের ১৪ জুন হবিগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা প্রোটনের উপর হামলা চালায়। হামলার পরবর্তীতে গুরুতর আহত অবস্থায় আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলে রাতে সাড়ে ১১টায় ২৬ বছরের ছাত্রনেতা প্রোটন মৃত্যুবরণ করেন। প্রোটনের মৃত্যুতে স্থানীয় ক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা বিক্ষোভে তাঁর হত্যার প্রতিবাদ জানায়। প্রোটন হত্যার মামলায় প্রধান আসামী লাখাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতিসহ ৯ জনের মধ্যে ৭জন গুরুত্বপূর্ণ নেতা কর্মীর নাম থাকায় আসামীরা ২০০৪ সালে বেকসুর খালাস পায় হবিগঞ্জ আদালত থেকে।

প্রোটন হত্যার বিচার হয়নি। প্রোটন শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখতো তাই নিজেকে যুক্ত করেছে ছাত্র ইউনিয়নের পতাকা তলে। শহীদ প্রোটন দাশগুপ্ত ছাত্র ইউনিয়নের সূর্যসন্তান।

শহীদ বসন্ত ব্যানার্জী

শহীদ বসন্ত ব্যানার্জী ১৯৪৯ সালে ফেব্রুয়ারিতে শ্রীমঙ্গলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নিংগো ব্যানার্জী। চা শ্রমিকের সন্তান বসন্ত ব্যানার্জী প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজেকে শিক্ষার আলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। আবার পড়ালেখা করে নিজেকে নিজের শ্রেণি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেননি। ছাত্র অবস্থায় যুক্ত হয়েছিলেন ছাত্র ইউনিয়নে। কারণ তাঁর কাছে ছাত্র ইউনিয়ন ছিল সমাজতন্ত্র শিক্ষার পাঠশালা। তিনি পাশাপাশি যুক্ত হন চা শ্রমিক সংগঠনে। সংগঠিত করেন শোষিত চা শ্রমিকদের। কিন্তু ভীত প্রতিক্রিয়াশীল চক্র মেনে নিতে পারেনি চা শ্রমিকের এই শিক্ষিত সন্তানকে। তাই জীবন দিতে হল শোষকদের হাতে। ১৯৭২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর চাকু, কাঁচি ও রামদা দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় ছাত্র ইউনিয়নের সাহসী সূর্যসন্তানকে।

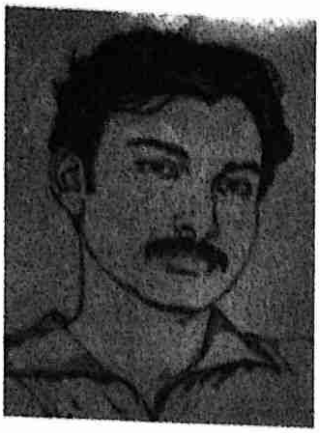

শহীদ সঞ্জয় তলাপাত্র

শহীদ সঞ্জয় তলাপাত্র ১৯৭৬ সালের ২২ আগস্ট চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কানাইলাল তলাপাত্র। মা সোভা তলাপাত্র। সঞ্জয় তলাপাত্র একমাত্র নিজের ইচ্ছায় ১৯৯৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগে ভর্তি হন। পাশাপাশি সমাজ বদলের স্বপ্ন নিয়ে যুক্ত হন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নে। ১৯৯৮ এর আগস্টের আগেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন। ফলে প্রতিদিন ক্যাম্পাসে স্টেশনে মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হত। ২০ আগস্ট। সেদিন সকালে বটতলী স্টেশনে মিছিলের কোন কর্মসূচি ছিল না। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার আগ মুহূর্তে ছাত্র শিবির কর্মীরা বড় লাঠি ও রড দিয়ে হামলা করে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের অনেকেই আহত হয়। ঘটনার প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবে বটতলী স্টেশনে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। ক্যাম্পাসের ভেতরেও মিছিল সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত হয়। সেদিনের বর্বর হামলায় স্টেশনের প্লাটফর্মে মৌলবাদী ঘাতকদের দ্বারা চারুকলার ২য় বর্ষের ছাত্র সঞ্জয় তলাপাত্র গুরুতর আহত হন। প্রতিদিনের মতো সেদিনও সঞ্জয় খাতা আর তুলির ব্যাগ কাঁধে নিয়ে শাটল ট্রেনে যেতে চেয়েছিল তার প্রিয় ক্যাম্পাসে। কিন্তু স্বাধীনতা-বিরোধী চক্রের লাঠি আর রডের আঘাত তাঁকে ক্যাম্পাসে পৌঁছাতে দেয়নি। গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি হতে হয় হাসপাতালে। তারপর দীর্ঘ ৪৮ ঘণ্টা মৃত্যুর সাথে লড়াই করে ২২ আগস্ট সকাল সাড়ে ৮টায় অত্যধিক রক্তক্ষরণে থেমে যায় একটি প্রাণবন্ত জীবন। ২২ আগস্ট ছিল সঞ্জয় তলাপাত্রের ২২তম জন্মদিন। ক্যাম্পাসে সঞ্জয়ের মৃত্যুর সংবাদ আসলে ১৪ হাজার ছাত্রছাত্রী ক্ষোভে, ঘৃণায়, প্রতিবাদে রাজপথে নেমে আসে আর আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে বলে– 'মাগো তোমায় কথা দিলাম, সঞ্জয় হত্যার বদলা নেব' সঞ্জয়ের ক্যাম্পাসে খুনী শিবিরের ঠাঁই নাই'। কত খণ্ড খণ্ড মিছিল কত দিক থেকে আসছিল তার কোন হিসেব ছিল না। কখনো বা মিছিলগুলো একসাথে মিলিত হয়ে, কখনো বা কয়েকটি অংশে ভাগ হয়ে খুনিদের এবং তাদের সহকর্মীদের খুঁজতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন উত্তাল অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তিন দিনের জন্য ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত করে। সঞ্জয়ের মৃত্যু সেদিন সকলকে ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস শিখিয়েছিল। দীর্ঘ ১২ বছরের ছাত্র শিবিরের অবরুদ্ধ ক্যাম্পাসকে সেদিন মুক্ত করার শক্তি যোগায় সঞ্জয়ের আত্মত্যাগ। ১৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর সম্মিলিত প্রতিবাদে প্রতিরোধে সঞ্জয়ের হত্যাকারী ঘাতকরা সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সঞ্জয় তলাপাত্র একটি অসাম্প্রদায়িক, সন্ত্রাসমুক্ত, শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে চেয়েছিল। চেয়েছিল দখলদারিত্বমুক্ত সবুজে ঘেরা ক্যাম্পাসে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে। কিন্তু তাঁর এই চাওয়া ঘাতকদের সহ্য হয়নি। তারা ভয় পেয়েছিল সঞ্জয়ের স্বপ্নকে, আদর্শকে। মৌলবাদী চক্রের ধারণা ছিল সঞ্জয় তলাপাত্রকে মারতে পারলে তাঁর আদর্শ ও স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল ভুল। সঞ্জয়ের মৃত্যুই এর জ্বলন্ত প্রমাণ। সঞ্জয়ের চেতনায় সেদিন গর্জে উঠেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্রছাত্রী। মুক্ত করেছিল দীর্ঘ একযুগের অবরুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়কে। শহীদ সঞ্জয় তলাপাত্র সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রামের সূর্য সেনানী।

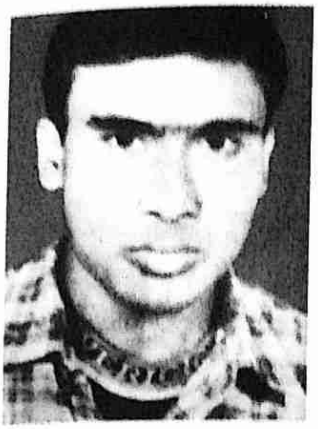

শহীদ আবুল হাশেম

শহীদ আবুল হাশেম কিশোরগঞ্জ জেলার নান্দাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আব্দুল হামিদ। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তাঁর পরিবার কিশোরগঞ্জ ছেড়ে রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার মীরবাগে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। হাশেম মীরবাগ থানার মহেশারের দ্বি-মুখী স্কুলে ৮ম শ্রেণিতে পড়াকালীন সময়ে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীতে এ স্কুল থেকে কৃতিত্বের সহিত এসএসসি ও কাউনিয়া ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ছাত্র ইউনিয়ন মীরবাগ থানা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এবং রংপুর জেলা সংসদের সদস্য ছিলেন। সে সময়ে রংপুরে গড়ে উঠা ছাত্র আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। 'শিক্ষা কোন সুযোগ নয়, শিক্ষা আমার অধিকার' এই শ্লোগানকে হাশেম ছোটবেলা থেকে মনের মধ্যে লালন করতেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল শোষণহীন, বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা।

১৯৯৮ সালে কাউনিয়া উপজেলা ছাত্র ইউনিয়ন নকলবিরোধী ও শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। হাশেম ছিলো এই আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃত্ব। যার ফলশ্রুতিতে ৮ অক্টোবর স্থানীয় সন্ত্রাসীরা রাতের অন্ধকারে ডিগ্রি পরীক্ষার্থী আবুল হাশেমকে নৃশংসভাবে হত্যা করে রেল লাইনের পাশে ফেলে চলে যায়।

হাশেম শিক্ষা ব্যবস্থার অসংগতি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল তাই সন্ত্রাসীরা তাঁকে বর্বরভাবে হত্যা করে। গণমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক, বৈষম্যহীন, শিক্ষা ব্যবস্থা আজো বাস্তবায়িত হয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার ৪১ বছর পরেও আমরা প্রকৃত শিক্ষানীতি পাইনি। শহীদ হাশেমের আত্মদান কখনো বৃথা যাবে না। তাঁর স্বপ্ন, আদর্শ অনন্তকাল বেঁচে থাকবে নীল পতাকার সাহসী তরুণদের স্বপ্নে।

শহীদ মো. মোখলেছুর রহমান

শহীদ মোখলেছুর রহমান নওগাঁয় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হাবিবুর রহমান, মা আলেজান বিবি। ১৯৬৩ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবস। তাজ হলে সভা হবে। প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিল সভাপতিত্ব করবেন মহকুমা প্রশাসক। নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও যখন মহকুমা প্রশাসক সভায় উপস্থিত হননি তখন ছাত্ররা নওগাঁ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষকে সভাপতি করে সভার কাজ শুরু করে। সভা চলাকালীন মাঝামাঝি সময়ে মহকুমা প্রশাসক সভায় আসেন এবং পুলিশ দিয়ে অধ্যক্ষকে সভাপতির আসন থেকে তুলে দেবার চেষ্টা করেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ছাত্ররা। নেতৃত্ব দান করে ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ এক পর্যায়ে গুলিবর্ষণ করে। সংঘর্ষে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মোঃ মোখলেছুর রহমান লিটন গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

শহীদ সৈয়দ আমিনুল হুদা টিটো

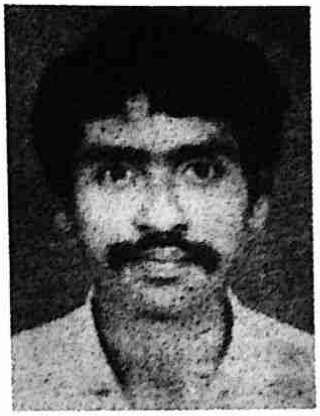

রক্ত যদি ঝরেই থাকে/রক্ত আরো ঝরবে/রক্তে ভেজা কালো পথেই/শেষ বিজয় গড়বে– চরণ কয়টি শহীদ টিটোর। নিজের রচিত কবিতার মতোই রক্ত দিয়ে কালো পথ ভিজিয়ে গণতন্ত্রের বিজয় এনেছেন সৈয়দ আমিনুল হুদা টিটো। পরিচিত জনেরা তাঁকে শেষ দেখেছিল ১৯৮৭ সালের ২০ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউর স্বৈরাচারবিরোধী দৃপ্ত মিছিলে। নূর হোসেনের কয়েক গজ পেছনে ছিল সে। শ্লোগানে উচ্চকিত তরুণ টিটো রাজপথ কাঁপিয়ে এগিয়ে চলছিল মিছিলে পা ফেলে। হঠাৎ মিছিলের গতি রুদ্ধ হলো ঘাতক পুলিশের গুলিতে। অনেকে লুটিয়ে পড়লো, বুকের রক্তে লাল হয়ে উঠলো কালো রাজপথ। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে সবাই। পরে তাঁর সহযোদ্ধারা টিটোকে খুঁজতে বের হয়। কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি তাকে। অনেক অনুসন্ধানের পর নিশ্চিত হওয়া যায় টিটো মারা গেছে পুলিশের গুলিতে– তার লাশ গুম করেছে পুলিশ। এই সাহসী বীর সন্তান সৈয়দ আমিনুল হুদা টিটোর জন্ম কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার দিলালপুর ইউনিয়নের মোল্লাপাড়া গ্রামের সৈয়দ পরিবারে ১৯৬২ সালের ১২ জানুয়ারি। তার পিতা সৈয়দ শামসুল হুদা, মাতা রহিমা খাতুন। তিনি পিতামাতার বড় ছেলে ছিলেন। তাঁর পরিবারে ছিল বুর্জোয়া দলের বড় বড় রাজনীতিবিদ। কিন্তু টিটো বেছে নিলেন রাজনীতির এমন ধারা যা হলো মেহনতি, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের। স্কুল জীবনেই টিটোর নেতৃত্ব গুণ বিকশিত হতে থাকে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা, ক্লাসের সমস্যা তিনি শিক্ষকদের নিকট তুলে ধরতেন। এস. এস. সি পাশের পর বাজিতপুর কলেজে ভর্তি হয়ে তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত হন। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি ছাত্র ইউনিয়ন বাজিতপুর কলেজ শাখার সভাপতি, থানা কমিটির সভাপতি ও জেলা কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। সাথে সাথে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হন। ১৯৮৩ সালে তিনি পার্টির পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেন। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা হয়েও তিনি তাঁর এলাকায় ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করে অল্পদিনের মধ্যে বিশাল ক্ষেতমজুর সমিতি গড়ে তোলেন। ১৯৮৫ সালে টিটো বাজিতপুর থানা ক্ষেতমজুর সমিতির যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি বাজিতপুর উপজেলা সম্মেলনে উপজেলার সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। এসবের মাঝেও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। কবিতার প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম প্রেম। ছোটবেলা থেকে কবিতা লিখতেন। কবিতার একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি আছে তার। ছোট গল্পকার হিসেবেও তিনি সমাধিক পরিচিত ছিলেন। সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে টিটো ছিলেন নিজ এলাকার সামনের কাতারের সৈনিক, এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭ এর ১০ নভেম্বর স্বৈরাচার এরশাদের পতনের দাবিতে ৭ দল ও ১৫ দলের যৌথভাবে গ্রহণ করা ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিতে আসার জন্য আগের দিন ঢাকা রওয়ানা হন। কর্মসূচি বানচাল করতে স্বৈরাচারী এরশাদ নেতা-কর্মীদের নির্যাতন সহ রাস্তাঘাট রেল যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তা দমিয়ে রাখতে পারেনি তারুণ্য দীপ্ত টিটোকে। কয়েকজন সাহসীকে নিয়ে চিড়া, মুড়ি নিয়ে রওয়ানা হলেন সাইকেলে চড়ে দীর্ঘ ৬০ মাইলেরও অধিক রাস্তা সাইকেলে চড়ে ৯ নভেম্বর হাজির হন ঢাকা কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে। পরদিন ১০ নভেম্বর যোগ দেন ঢাকার পিচঢালা রাজপথে লাখো সংগ্রামীর ছাত্র জনতার মিছিলের অগ্রভাগে। মিছিলে চলে স্বৈরাচারী শাসকের গুলি।

হারিয়ে যান টিটো। খোঁজও মেলেনি টিটোর লাশের। রওয়ানা হবার পূর্বে টিটো বাজিতপুর কলেজের শিক্ষক ইন্দ্রজিতকে বলেছিলেন 'স্যার সাইকেলে চড়ে ঢাকা অবরোধে যাচ্ছি। স্বৈরাচারের পতন না হওয়া পর্যন্ত ফিরবনা, আশীর্বাদ করবেন।' স্বৈরাচারের পতন হয়েছে কিন্তু টিটো ফিরেন নি। টিটো গিয়েছিলেন শোষিত সংগ্রামী নিপীড়নের মিছিলে। তিনি হারান নি; টিটোর মত বীররা হারান না, টিটো আছেন জনতার বিরতিহীন মিছিলেই।

শহীদ ময়নুল আকতার রুবেল

শহীদ ময়নুল আকতার রুবেল বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার দেউলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গোলাম মোস্তফা, প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য রুবেল ছোটবেলা থেকে মেনে নিতে পারেনি। তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য দূর করতে ধনী ও গরিব সকলের শিক্ষার নিশ্চয়তার জন্য শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র ইউনিয়নের ঐক্য, শিক্ষা, শান্তি ও প্রগতির নীল পতাকাকে আদর্শ হিসেবে নিয়েছিলেন। রুবেল গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা ছাত্র ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। ১৯৮৬ সালের ১২ নভেম্বর গোবিন্দগঞ্জ ছাত্র ইউনিয়নের উপজেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ইউনিয়নের আদর্শকে যারা মানতে চায় না সেই ভীত সন্ত্রাসীরা সম্মেলন মঞ্চে পরিকল্পিত ভাবে হামলা চালায়। প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায় ছাত্ররা। অগ্রভাগে ছিলেন ময়নুল আখতার রুবেল। সন্ত্রাসীদের হামলায় গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি করানো হয় রংপুর মেডিকেল কলেজে। কিন্তু ১২ নভেম্বর মাত্র ২১ বছর বয়সে রুবেল মৃত্যুবরণ করেন।

শহীদ মো. আজহারুল ইসলাম

শহীদ আজহারুল ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে খুলনায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মো. মনসুর আলী, মা শরীফা বেগম। আজাহার বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন খুলনা জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯০ সালের ১২ নভেম্বর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে। মিছিল ও সমাবেশ শেষে বাড়ি ফেরার পথে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী সন্ত্রাসীরা তাঁর উপর হামলা চালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে আজহার মৃত্যুবরণ করেন।

শহীদ গৌরপদ দেব কানু

১৩৫০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করেন শমশের নগর রোড, মৌলভীবাজারে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মৌলভীবাজার সর্বপ্রথম যাদের উপর নির্যাতনের খড়গ নেমে আসে তাদের অন্যতম ছিলেন গৌরপদ দেব কানু। পাকিস্তানী সৈন্যরা তাঁকে মৌলভী বাজারে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আটকে রেখে নির্মম নির্যাতন করে এবং ৩০ মার্চ ১৯৭১-এ গুলি করে হত্যা করে।

শহীদ ওবায়দুর রউফ পলু

শহীদ ওবায়দুর রউফ ১৯৬৫ সালের নভেম্বরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আব্দুর রউফ পুলিশ অফিসার। ওবায়দুর রউফ পলু কলেজ জীবনের শুরুতে যুক্ত হন মানুষ গড়ার কারিগর বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নে। তিনি খুব দ্রুত ছাত্র ইউনিয়নের জেলা কমিটির প্রথম সারির নেতৃত্বে নিজেকে পরিচিত করে তোলেন। ১৯৮৩ সালে ব্রা?ক্ষণবাড়িয়া জেলা বাস্তবায়ন পরিষদের আহ্বানে ব্রাহ্মনবাড়িয়া মহকুমাকে জেলা ঘোষণার দাবিতে হরতাল পালিত হয়। হরতাল সফল করতে গিয়ে ২৭ নভেম্বর পুলিশের গুলিতে ওবায়দুর রউফ পলু মৃত্যুবরণ করেন। শহীদ পলুর নামে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের একটি ছাত্রাবাসের নামকরণ করা হয়।

শহীদ সুভাষ

গরিব পিতামাতার সন্তান সুভাষ তার গায়ের শ্যামলা বরণের জন্য ঘনিষ্ঠ সকলের কাছে পরিচিত ছিল কালু নামে। অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা সুভাষ ছোটবেলা থেকেই রাজনীতিতে সচেতন ছিলেন। ঊনসত্তরের উত্তাল দিনগুলোতে বাংলাদেশ যে অগ্নিময় অবস্থা ধারণ করেছিল তার উত্তাপ থেকে সুভাষ বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমিউনিস্ট পার্টি কক্সবাজার শাখার সদস্য কক্সবাজার ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের বিশিষ্ট নেতা হিসেবে সুভাষ ছিলেন সকলের অতি প্রিয়পাত্র।

সুভাষের বাড়ি ছিল কক্সবাজারের টেকপাড়া গ্রামে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে কক্সবাজার শহরের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতে প্রথম শিকার হন সুভাষ ওরফে কালু। পাক হানাদার বাহিনীর আক্রমণ শুরু হলে নেতৃবৃন্দ গা ঢাকা দিলে কালু তা করেনি। নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে মা-বাবাকে শহর থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য শহরে এসে শত্রুপক্ষের হাতে আটক হন সুভাষ।

এক সময়ের স্কুল সহপাঠী মাহমুদ যে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়েছে সে কালুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে হিচড়ে নিয়ে যায়। কালুকে বর্বরভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ই এপ্রিল ২৭ বছর বয়সে শহীদ হয়েছিরেন সুভাষ।

শহীদ নিবাস ভট্টাচার্য বলাই

ছাত্র ইউনিয়নের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বাহিনী মৌলভীবাজারের বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। সেদিন বলাইয়ের জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিল সর্বোচ্চ নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা। তারা নিবাস ভট্টাচার্য বলাইকে জীপ গাড়ীর পেছনে বেঁধে রাস্তায় টেনে-হেঁচড়ে পুরো শহর প্রদক্ষিণ করে। পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের প্রথম সারির যোদ্ধা ছিলেন বলাই।

শহীদ সিরাজুম মুনীর

শহীদ সিরাজুম মুনীর ১৯ জৈষ্ঠ্য ১৩৫৪ বাংলা সনে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দলিল উদ্দিন আহমদ, মা জাহানারা আহমদ। ছোটবেলা থেকেই মুনীরের বই পড়ার প্রতি ছিল আগ্রহ। মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর যুক্ত হন অসাম্প্রদায়িক সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নে। দুঃখ দারিদ্র্য তাঁকে প্রবল ভাবে ভাবিয়ে তুললো। তাঁর স্বপ্ন ছিল শোষণহীন, বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। মুনীর ঢাকা নগর কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭১ সাল মুনীর এম এ শেষ পর্বের ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি-ন্যাপ-ছাত্র ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেন। রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেন। '৭১-এর ১১ নভেম্বর কুমিল্লার বেতিয়ারা যুদ্ধে পাক মিলিটারীর সাথে সম্মুখ সমরে সিরাজুম মুনীর শহীদ হন। শহীদ সিরাজুম মুনীর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। বাংলা একাডেমীর অমর সংকলন '৭১-এ তাঁর ছোট গল্প 'শিল্পী' প্রকাশিত হয়। পরিবারের বড় সন্তান হওয়া সত্ত্বেও দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ ছিল পরিবারের প্রতি কর্তব্যবোধ তুলনায় অনেক বেশি তাই– তিনি পরিবারের দায়িত্ব উপেক্ষা করে দেশের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন।

শহীদ নিজাম উদ্দিন আজাদ

শহীদ নিজাম উদ্দিন আজাদ ১৯৪৮ সালের ১৪ আগস্ট ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কামরুদ্দিন আহমেদ, মা জোবেদ খানম। নিজামউদ্দিন আজাদ ঢাকার রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল থেকে মাধ্যমিক, ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অসাম্প্রদায়িক সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নে যুক্ত হন। নিজ মেধা ও যোগ্যতায় অল্প দিনের মধ্যে সংগঠনের প্রথম সারির নেতৃত্বে চলে আসেন। তিনি ঢাকা জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। আজাদ যখন ২য় বর্ষের ছাত্র তখন দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক আসে। সবকিছু পিছনে ফেলে দেশের মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে যোগ দেন ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের গেরিলা বাহিনীতে। গেরিলা বাহিনীর দ্বিতীয় দলের নেতা আজাদ। ১১ নভেম্বর প্রশিক্ষণ শেষে গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে গেরিলা বাহিনী নিয়ে দেশমাতাকে মুক্ত করার জন্য স্বদেশে প্রবেশকালে বেতিয়ারায় ওতপেতে থাকা পাক সেনারা হঠাৎ আক্রমন করে। যৌথ গেরিলা দলের যোদ্ধাদের রক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে সবার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে হাতের অস্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কিন্তু যোদ্ধাদের রেখে তিনি পেছনের দিকে যাননি। পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতি প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করে স্বাধীনতার সূর্যসৈনিক আজাদ সহ-যোদ্ধাদের নিরাপদে পশ্চাদপসারণ করার সুযোগ করে দেন। কিন্তু নিজে বরণ করে নেন সাহসী মৃত্যু।

শহীদ শহীদুল্লাহ সাউদ

শহীদ শহীদুল্লাহ সাউদ নারায়ণগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রমিক পিতা জাবেদ আলীর পুত্র সাউদ স্কুল জীবনেই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। গোদনাইল প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করে তিনি ভর্তি হন গোদনাইল হাই স্কুলে। স্কুল জীবনে মানুষ গড়ার কারখানা বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নে সাথে যুক্ত হন। তিনি গোদনাইল উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। শহীদুল্লাহ সাউদ যখন ক্লাস নাইনের ছাত্র তখন শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ, মাত্র ১৪ বছর বয়সে দেশকে ভালবেসে যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টি-ন্যাপ-ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলা বাহিনীতে। দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যান। অল্প বয়সের কারণে ক্যাম্পের প্রশিক্ষকরা তাঁকে প্রশিক্ষণে নিতে আপত্তি জানালেও তাঁর অদম্য সাহস ও প্রবল ইচ্ছায় প্রশিক্ষণ নিতে রাজি হন। ১১ নভেম্বর ১৯৭১ সাল। কমিউনিস্ট পার্টি-ন্যাপ-ছাত্র ইউনিয়নের গেরিলা বাহিনীর সাথে সাউদ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রামের বেতিয়ারায় প্রবেশ করেন। লক্ষ্য ছিল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পার হয়ে ফেনীতে অপারেশন চালানোর। কিন্তু বেতিয়ারায় ওঁতপেতে থাকা পাক হানাদার বাহিনীর হঠাৎ আক্রমণে শুরু হয় যুদ্ধ। বেতিয়ারা যুদ্ধে অন্যান্যদের মধ্যে শহীদ হন দুরন্ত সাহসী সূর্য সেনানী ছাত্র ইউনিয়ন নেতা কিশোর শহীদুল্লাহ সাউদ। শহীদ শহীদুল্লাহ সাউদ বেতিয়ারা যুদ্ধে সর্বকনিষ্ঠ শহীদ।

শহীদ রতন কুমার বর্মণ

চট্টগ্রাম সিটি কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন রতন কুমার বর্মন। ১৯৭১-এ যুদ্ধ শুরু হলে রাঙ্গুনীয়ায় চলে যান। ৮ এপ্রিল বাবার জন্য ঔষধ কিনতে বের হয়ে পথে কাপ্তাইয়ের পথে নিখোঁজ হন। এরপর তিনি আর ফেরেননি। শহীদ রতন কুমার বর্মন ছাত্র আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতাই ছিলেন না তিনি চট্টগ্রাম বেতারের একজন নিয়মিত শিল্পীও ছিলেন।

শহীদ ফরহাদ উল্লাহ মোঃ এজাহারুল ইসলাম

সমাজ বদলের দৃপ্ত স্বপ্নের এক অগ্রগামী সংগ্রামী ছিলেন ফরহাদ উল্লাহ মোঃ এজহারুল ইসলাম। চট্টগ্রাম সিটি কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের একনিষ্ঠ কর্মী কালুর ঘাট দখলের পর ৬ মে ১৯৭১ সালের রাতে পাক বাহিনী কর্তৃক বাঁশখালী খালপাড়ে আক্রান্ত হন এবং জীবিত অবস্থায় ৭ মে সকালে স্থানীয় মসজিদে আসলে আলবদর বাহিনীর সদস্যরা সেখান থেকে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

শহীদ জগৎজ্যোতি

সুনামগঞ্জের পর্টি অঞ্চলের এক বীর মুক্তিযোদ্ধা জগৎজ্যোতি দাস। জগৎজ্যোতি ১৯৪৯ সালের ২৬ এপ্রিল হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলার জলসুকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জীতেন্দ্র চন্দ্র দাস। মাতা হরিমতি দাস। জগৎজ্যোতির যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তাকে ভর্তি করা হয় গ্রামের তৎকালীন এম ই স্কুলে। বিনম্র আচরণ ও ভদ্রতার কারনে জ্যোতি সবার প্রিয় ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শেষ করলে জগৎজ্যোতিকে স্থানীয় গ্রামে অবস্থিত আজমিরীগঞ্জ এমালগেমে টেড বীরচরণ হাইস্কুলে ভর্তি করা হয়। জগৎজ্যোতি শরিফ শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলে।

১৯৭১ সালে ছাত্র ইউনিয়নের একজন প্রথম সারির কর্মী হিসেবে জগৎজ্যোতি স্বভাবতই সুনামগঞ্জ শহরে অনুষ্ঠিত স্বাধীকার আন্দোলনের সকল কর্মসূচিতে অগ্রভাগে থাকেন এবং সশস্ত্র যুদ্ধে নিজেকে সম্পৃক্ত করার সংকল্প করেন। সুনামগঞ্জ শহর পাক বাহিনীর দখলে চলে যাওয়ার পর স্থানীয় সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ ও মুক্তিযোদ্ধারা বালাট চলেন যান। সেখান থেকে প্রথম ১১৪ জনের দলটিকে ভারতের শিলং এ যে গোপন ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন জগৎজ্যোতি। হবিগঞ্জ জেলা ছিল টেকেরঘাট সাব-সেক্টরের অধীনে। প্রশিক্ষণ শেষে জগৎজ্যোতির এই দলটিকে নৌপথে হানাদারদের বাধা প্রদানের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়। নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে জগৎজ্যোতি হায়নাদের ঠেকাতে একের পর এক আক্রমণ চালাতে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি ও রাজাকারদের কাছে দাস পার্টি ছিল এক মুক্তিমান আতঙ্কের নাম। আর এই দলটির দায়িত্বে ছিল জগৎজ্যোতি দাস।

হাই কমান্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বানিয়াচং অপারেশনের উদ্দেশ্যে পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে জগৎজ্যোতি শাল্লা থানার গোপরাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসেন। সেখানে দাস পার্টির সাথে আরো আটজন মুক্তিযোদ্ধা যুক্ত হন। টেকেরঘাট সেক্টর থেকে একটি গানবোট আসছে বলে জ্যোতিকে জানানো হয়। গান বোটটি ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধারা দু'ভাগে ভাগ হয়ে নদীর দু'পাশে অবস্থান নেয়। কার্গোটি আসামাত্র গুলি চালাতে থাকে দাস পার্টির সদস্যরা। বিপাকে পড়ে আত্মসমর্পণ করে বোটের ভিতরে থাকা পাকসেনা ও তাদের দোসররা। সেখানে কার্গোটি ডুবিয়ে দেওয়া হয়, হত্যা করা হয় চারজন রাজাকারকে। সফল নেতৃত্ব দেন জগৎজ্যোতি দাস।

বানিয়াচং এ সফল অভিযানের পর জ্যোতির নেতৃত্বে দাস পার্টি কুড়িগ্রাম থেকে শাল্লার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। শাল্লা থানা সদরের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে জগৎজ্যোতি ১৭ আগস্ট সঙ্গীদের নিয়ে অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থানকালে দাস পার্টি জানতে পারে বানিয়াচং থানার মাকালকান্দি গ্রামে পাক হানাদারেরা আক্রমণ করে অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে। নারীদের উপর চালিয়েছে পাশবিক নির্যাতন। এদিন রাতেই জ্যোতি সোর্স মারফত জানতে পারেন পরদিন হানাদারেরা পাথরপুর গ্রামে অপারেশন চালাবে। এই খরব শুনে তিনটি নৌকায় করে দাস পার্টির ১২ জন যোদ্ধা রওনা হয় পাহাড়পুরের উদ্দেশ্যে।

শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ করতে তিনি নিজেই একজন ফেরিওয়ালার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। প্রায় দুই ঘন্টা অবস্থানের পর শত্রুপক্ষের আগমন প্রত্যক্ষ করে দাস পার্টি। ৫০ জন পাকসেনা ও দেশীয় রাজাকার মিলে তারা নৌকাযোগে আসে। পাহাড়পুর পৌঁছার পর পাক হানাদাররা রাজাকারদের নির্দেশ দেয় গ্রামের মানুষদের একত্রিত করার জন্য। এক পর্যায়ে জ্যোতির নেতৃত্বে

নৌকায় অবস্থানকারী রাজাকারদের তারা মেরে ফেলল এবং হানাদারদের উপর তীব্র আক্রমণ শুরু করল। প্রায় দুই ঘন্টা যুদ্ধ চলার পর হানাদারেরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। সেখান থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে দাস পার্টি রওনা হয় দিরাই ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে।

তিনি বহিঃশত্রুদের ঘায়েল করতে এমন সব পন্থা অবলম্বন করতেন যা ছিল বিস্ময়কর। এমনই একটি অভিযান পরিচালনা করেন জ্যোতি শেরপুরে। শেরপুর আজমিরীগঞ্জ রুট ব্যবহার করে হানাদারেরা তাদের সব সরঞ্জাম নির্বিঘ্নে পৌঁছে দিত বিভিন্ন এলাকায়। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খবর আসে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে বেশ কয়েকটি চালান নদীপথে নিয়ে আসার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে পাক বাহিনীরা। তাৎক্ষণিকভাবে জ্যোতির নেতৃত্বাধীন দাস পার্টিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে কোন মূল্যে গান বোটগুলো ধ্বংস করার জন্য। জগৎজ্যোতির নির্দেশ অনুযায়ী নদীর পশ্চিম তীরে পানির নিচে একটা খুঁটি পোতা হয় অপর একটি খুঁটি পোতা হয় নদীর পাড়ে। খুঁটি দুটি একটা শক্ত রশি দিয়ে বাঁধা হয়। এই রশিতে পাঁচটি অ্যান্টি মাইন ট্যাঙ্ক ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

রাত ১১ টায় একটা নৌবহর দেখে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। নৌবহরটি মাইন লাইনে আসা মাত্র জ্যোতির নির্দেশে টার্গেট বরাবর রকেট লাঞ্চার থেকে একটি গোলা নিক্ষেপ করা হয়। অন্যদিকে মাইন সিরিজের ফিউজে সেফটি ম্যাচ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। মুহূর্তের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। ধ্বংস হয় গোলাবারুদবাহী হানাদারদের গানবোট।

বদরপুর ব্রীজ ধ্বংসের ব্যাপারে জ্যোতি তার নিজের রণকৌশলে কমসংখ্যক সরঞ্জামাদি দিয়ে বদরপুর ব্রীজ ধ্বংস করে দেন যাতে করে হানাদাররা ঐ পথ দিয়ে না আসতে পারে।

জগৎজ্যোতির নেতৃত্বে জামালপুর থানা আক্রমণ দাস পার্টির অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব। জামালপুর শত্রুমুক্ত করার জন্য জ্যোতি জামালপুর থানা আক্রমণ করে সেখানে অবস্থানরত রাজাকারদের হত্যা করতে সফল নেতৃত্ব দেয় জগৎজ্যোতি। এরপর জগৎজ্যোতি অনেকগুলো সফল অভিযান পরিচালনা করেন যেমন শ্রীপুর অভিযান, খালিয়াজুড়ী থানা আক্রমণ, রাণীগঞ্জ ও কাদিরগঞ্জ অভিযান। এরপর একে একে দিরাই-শাল্লা অভিযান, শাহজিরবাজার আশুগঞ্জ বিদ্যুত লাইন বিচ্ছিন্নকরণ করা হয় জগৎজ্যোতির নেতৃত্বে।

মুঞ্জিয়ারগাঁওয়ে যাওয়ার সময় হানাদারেরা তাদের তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলে। জগৎজ্যোতির নেতৃত্বে দাস পার্টিও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারেনি। যখন তিনদিক থেকে আক্রমণ শুরু হয় তখন জ্যোতি ও তার বাহিনী বিলের মধ্যে অবস্থান করেন কিন্তু, সেখান থেকে তারা একটুকুও সরে যেতে পারে না। পাকবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে একে একে দাস পার্টির অনেকে মারা যায়। জগৎজ্যোতি প্রাণপণ যুদ্ধ করতে থাকে। তার নির্ভুল নিশানায় ১৪ জন পাকসেরা মারা যায়। দুপুর গড়িয়ে যখন সন্ধ্যা হয় তখন জগৎজ্যোতির সাথে মাত্র ১ জন সহযোদ্ধা থাকে। শেষ সহযোদ্ধা ইলিয়াস জগৎজ্যোতিকে পিছু হটতে বললে জ্যোতি শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। হঠাৎ একটা গুলি এসে জ্যোতির বুকে বিদ্ধ হয়। জ্যোতি শেষবারের মত চিৎকার করে ওঠেন- আমি যাইগ্যা! ইলিয়াস পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখে তার প্রিয় কমান্ডার ও প্রাণপ্রিয় যোদ্ধা জ্যোতির তেজময় দেহ পানিতে ডুবে যাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস তার কমান্ডারকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে কোমর পানিতে কাঁদার মধ্যে নিথর দেহ ডুবিয়ে দেন সুযোগ পেলে পুনরায় এসে লাশ তুলে নেওয়ার প্রত্যাশায়। এভাবে অনন্য মুক্তিযোদ্ধা জগৎজ্যোতি দাস দেশ ও মাতৃকার জন্য যুদ্ধে শহীদ হন।

শহীদ অজিত সরকার

জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী, বত্রিশ কিশোরগঞ্জে। ছাত্র ইউনিয়ন কিশোরগঞ্জ শহর কমিটির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭১ সালের ৬ আগস্ট গফরগাঁও পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে বন্দী হন এবং শহীদ হন।

শহীদ আবুল কাশেম শরফুদ্দিন আহমেদ দুলাল

১৯৫২ সালের ১ জানুয়ারি ১৩, রামবাবু রোড, ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম শামসুদ্দিন আহমেদ। আবুল কাশেম শরফুদ্দিন ময়মনসিংহ পলিট্যাকনিক্যালের আহসানউল্লাহ হল ছাত্র ইউনিয়নের বলিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষের দিকে আল-বদর বাহিনী দুলালকে ধরে আলীয়া মাদ্রাসায় নিয়ে যায়। পরে তিনি আর ফিরে আসেননি।

শহীদ নজরুল ইসলাম মজনু

কিসমত উদ্দিন তালুকদার ও আজিজা আক্তার খাতুনের পুত্র শহীদ নজরুল মজনু হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬২ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজে ভর্তি হন। স্কুল জীবন থেকেই তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি '৬৩-৬৪ বর্ষে গুরুদয়াল কলেজ ছাত্র সংসদের কমনরুম সম্পাদক ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন নামকরা ফুটবলার ও দক্ষ সংগঠক। নজরুল ইসলাম মজনু প্রথম থেকেই মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ নেন। কালীগঞ্জ রেল ব্রীজের নিকট যুদ্ধরত অবস্থায় রাজাকারদের হাতে ধরা পড়েন এবং পরে কিশোরগঞ্জ সিদ্ধেশ্বরী ঘাটে পাকিস্তান বাহিনীর নির্যাতনে শহীদ হন।

শহীদ মোঃ রফিকউদ্দিন আহমেদ বুলবুল

১৯৫১ সালের ২রা মার্চ নিশ্চিন্তপুর, বারিয়াকান্দি, ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। আহসানউল্লাহ হলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন বুলবুল। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। রফিকুদ্দিন আহমেদ বুলবুল আলবদর বাহিনীর হাতে ধৃত অবস্থায় তাকে আলীয়া মাদ্রাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

শহীদ সমীর সোম

১৯৫৪ সালের ৭ মার্চ কালীঘাট রোড, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে অধ্যয়নরত অবস্থায় ছাত্র ইউনিয়নে যুক্ত হন। দেরাদুনে গেরিলা ট্রেনিং নিয়ে কমলপুর সীমান্ত অতিক্রম করে শ্রীমঙ্গলের বালিশিরা পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে তিনিও তার দল পাক বাহিনীর হাতে আটক হন। শ্রীমঙ্গল পৌর ভবনের সামনে তাদেরকে অমানুষিক নির্যাতন করে হত্যা করা হয়।

শহীদ মোঃ বদিউল আলম

বশিরউদ্দিন আহমেদের পুত্র মোঃ বদিউল আলম ১৯৪৯ সালের ১০ জানুয়ারি গাইবান্ধায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৬ সালের ২৪শে আগস্ট প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ৪র্থ বর্ষ পুরকৌশল বিভাগের ছাত্র ছিলেন। 'বদি ভাই' নামে সমধিক পরিচিত সকলের প্রিয় বদিউল আলম বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আহসানউল্লাহ হল শাখার সবাপতি ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে তাঁকে আল বদররা আলীয়া মাদ্রাসায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে তিনি আর ফিরে আসেননি।

শহীদ নিতাই দেবনাথ

শহীদ নিতাই দেবনাথ ছিলেন বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। কলেজ ছাত্রাবস্থায় তিনি ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেন এবং মহকুমা ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম সারির কর্মী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যান। তাঁকে আসামের তেজপুর সালুনবাড়ী ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। সেখানে প্রশিক্ষণকালীন দুর্ভাগ্যজনক এক ঘটনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শেষ কৃত্যে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিগ্রেডিয়ার আর. কে. অগ্নিহোত্রা। সামরিক মর্যাদায় তাঁকে দাহ করা হয়।
শহীদ নিতাই দেবনাথ এর মৃত্যুর পর তাঁর মাতা একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যান এবং এর অবস্থায় মারা যান।

শহীদ মোঃ আলী জিন্নাহ

চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র ইউনিয়নের পরিচিত মুখ। ১৯৭১ সালে তিনি চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম সিটি কলেজ ছাত্র সংসদ (নৈশ)-এর নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। সমাজ পরিবর্তনের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। চট্টগ্রাম শহরে উপস্থিত থেকেই শহরে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন এবং কয়েকটা সফল অপারেশন করেন। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে আওয়ামী লীগের নিজস্ব বাহিনী অপহরণ করে হত্যা করে।

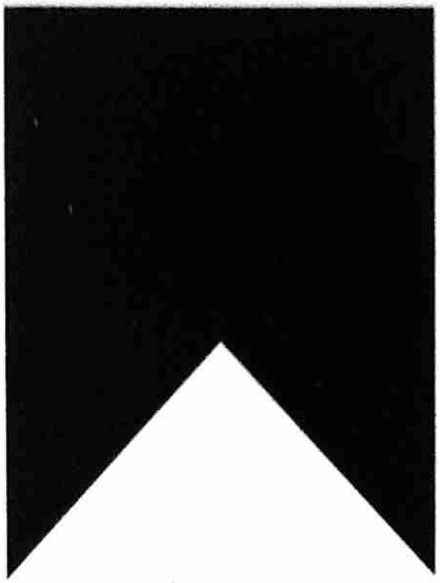

শ্রদ্ধাঞ্জলী

বদরুল আলম, সাজ্জাদ হোসেন খোকন, বিজয় কুমার বণিক
মানিক সাহা, প্রকাশ দেবনাথ, অলিউর রহমান লেবু
আব্দুর রশিদ, আব্দুর জব্বার মিয়াসহ
ছাত্র ইউনিয়নের আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে
মানব মুক্তির সংগ্রামে আমাদের যে সকল সহযোদ্ধারা
প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জালী